দিয়াশলাই

সচলায়তন অণুগল্প সংকলন

বৈশাখ ১৪১৫

স প্রকাশায়তন

দি য়া শ লা ই

সচলায়তন অণুগল্প সংকলন

বৈশাখ ১৪১৫

প্রকাশায়তন

দিয়াশলাই

সচলায়তন অণুগল্প সংকলন, বৈশাখ ১৪১৫

প্রথম অন্তর্জাল সংস্করণ

বৈশাখ ১৪১৫ | এপ্রিল ২০০৮

প্রকাশক

অমিত আহমেদ

প্রকাশায়তন, ঢাকা- ১২১৩

© sachalayatan.com

aumit.ahmed@gmail.com

সম্পাদনা পরিষদ

আনোয়ার সাদাত শিমুল

মু. নূরুল হাসান

প্রচ্ছদ

আহমেদ অরূপ কামাল

ISBN

984-300-002033-0

‘**Diyashlai: Sachalayatan Onugolpo Songkolon**’ a collection of Bengali flash fictions, edited/published by Aumit Ahmed on behalf of Prakashyatan, sachalayatan.com, cover designed by Ahmed Arup Kamal, first Internet edition published on Boishakh 1415, April 2008.

মুখবন্ধ

সচলায়তন ব্লগার 'সংসারে এক সন্ন্যাসী' অনুবাদিত ধারাবাহিক অণুগল্প পোস্ট গুলির দরুণ আমরা জানতে পারি স্বনামধন্য সাহিত্যিকরা অল্প পরিসরে কী শক্তিশালি গদ্যই না রচনা করার ক্ষমতা রাখেন। তাঁর অনুবাদ গুলোর জনপ্রিয়তার সাথে সাথেই পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে 'অণুগল্প' ধারাটির প্রতি ব্লগারদের আগ্রহ। অনেকেই অনুবাদ ও নতুন অণুগল্প নিয়ে উপস্থিত হন। সচলায়তনে অণুগল্পের এই জাগরণের মুহূর্তে আমাদের মনে হয় সচলায়তন ব্লগারদের আনকোড়া লেখা নিয়ে একটি অণুগল্প সংকলন করলে কেমন হয়? শুরু হয় পহেলা বৈশাখকে সামনে রেখে সচলায়তনের প্রথম অণুগল্প সংকলন 'দিয়াশলাই' এর কাজ - যেটি সম্ভবত হবে বাংলা ভাষার প্রথম আধুনিক অণুগল্প সংকলন।

'অণুগল্প' (ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ফ্ল্যাশ, মাইক্রো, পোস্টকার্ড কিংবা সাডেন ফিকশন) এর ধারণাটি কিন্তু নতুন নয়। সাহিত্য গবেষকেরা প্রাচীন গ্রিসের মুখে মুখে গল্প বলিয়েদেরকেই প্রথম অণুগল্পকার হিসেবে স্বীকৃতি দেন। সে হিসেবে ঈশপকে (গ্রিস, ৬২০-৫৬০ খ্রীস্টপূর্ব) আমরা বলতে পারি সর্বপ্রথম জনপ্রিয় অণুগল্পকার। উপমহাদেশে অণুগল্পের ধারণাটি গ্রিসের মত প্রাচীন নয় ঠিকই, কিন্তু খুব সদ্যও নয়। সম্রাট আকবর সভার রাজা বীরবল (১৫২৮-১৫৮৬) কিংবা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সভার গোপাল ভাঁড় (১৭১০-১৭৮৩) এর গল্প গুলোও অণুগল্পের কাতারেই পড়ে। গবেষকরা হয়তো বলতে পারবেন এর আগেও উপদেশমূলক প্রবাদ-প্রবচনের মূল কিংবা পৌরানিক গল্প-কাহিনীর মাধ্যমে উপমহাদেশে অণুগল্পের ধারণা চলমান ছিলো কি-না।

আধুনিক লেখকদের অনেকেই এই ধারাটিকে টেনে নিয়ে গেছেন, যাচ্ছেন। বলা যায় আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, ও হেনরী, আনাতোলি ক্রুশকিন, এদওয়ার্দ উস্পেনস্কি, আ. ক্লিমোভ, এইচ. পি. লাভক্র্যাফট, আন্তন চেকভ, ফ্রানৎস কাফকা, বলেসওয়াস প্রুস, রে ব্র্যাডব্যরি, বনফুল, সুবিমল মিশ্র, প্রমুখের নাম।

আমাদের যন্ত্রযুগের ব্যস্ত জীবনযাত্রায় অন্তর্জালিক পত্রিকাগুলোতে অণুগল্পের ধারণাটি নতুন করে বেঁচে উঠেছে। নানান ভাষায় অসংখ্য অন্তর্জালিক পত্রিকা আছে যেগুলো কেবল অণুগল্পই প্রকাশ করে থাকে। সেখানে অল্প পরিসরের লেখা গুলো কাজের ফাঁকে ফাঁকেই দ্রুত পড়ে নেয়া যায়। কিছু সমালোচক তো এমনও বলে বসেছেন যে কিছু অণুগল্পের আবেদন উপন্যাসের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়! শব্দ সংখ্যার উপর ভিত্তি করে অণুগল্পের বিভিন্ন উপধারাও তৈরি হয়েছে। যেমন বলা যায় ফিফটিফাইভ-ফিকশন এর কথা যেখানে শব্দ সংখ্যা হতে হবে কাঁটায় কাঁটায় পঞ্চান্ন। এমনি ভাবে আছে ড্রাবল (একশো শব্দ), সিক্সটিনাইনার্স (ঊনসত্তুর শব্দ), অন্যান্য।

'দিয়াশলাই' এর সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন বন্ধুবর আনোয়ার সাদাত শিমুল, মু. নূরুল হাসান। প্রকাশনার জন্য যে পরিমান শ্রম তাঁরা দু'জন দিয়েছেন তা কেবল নিগুঢ় ভালোবাসা থাকলেই সম্ভব। ধন্যবাদ জানিয়ে সে ভালোবাসার অবমাননা করতে চাই না। প্রচ্ছদ নিয়ে আহমেদ অরূপ কামালকে সময়ে অসময়ে নানান ভাবে বিরক্ত করার চেষ্টা করেছি। প্রতিবারই উনি বিরক্ত না হয়ে খুশি মনেই কাজটি করে দিয়েছেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা। এছাড়া আমাদের কাজে সকল ব্লগাররই আশাতীত সহযোগিতা করেছেন, যাঁদের মধ্যে বিশেষ করে বলতে হয় আহমেদুর রশীদ ও মাহবুব লীলেনের নাম। এই সুযোগে তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিতে চাই।

শেষে বলি, এই সংকলনটির প্রতিটি গল্পই আমরা একাধিক বার পড়েছি এবং প্রতিবারই আলাদা ভাবে আনন্দ পেয়েছি! সেই আনন্দের সামান্যতমও যদি আপনাদেরকে ফিরিয়ে পারি তবেই নিজেদেরকে স্বার্থক মনে করবো।

অমিত আহমেদ
প্রকাশায়তন

বাবা আর কাঠগোলাপ গাছ	-	বিবাগিনী	৫
ক্লিনিক্যাল ডেথ	শেখ জলিল	শেখ জলিল	৬
কপাল	মাহবুব আজাদ	হিমু	৭
আকাশ অবশ্যই সূর্যের চেয়ে বড়	গৌতম রায়	গৌতম	৭
এগারোটি রজনীগন্ধা	আহমেদ রাহিদ	অমিত	৮
পলাতক গদ্যগ্রহ	ফকির ইলিয়াস	ফকির ইলিয়াস	৯
তেপান্তর	কৌশিক দে	খেকশিয়াল	১০
হাতিসোনা	মাহবুব আজাদ	হিমু	১১
দুই পাহাড়	ইশতিয়াক রউফ	ইশতিয়াক রউফ	১২
টান	মোহাম্মদ আবদুল মুকিত	জ্বিনের বাদশা	১৩
পাস ফেল	-	অলৌকিক হাসান	১৪
ম. লিপস্কেরভ এর 'লাভ স্টোরি'	-	সংসারে এক সন্ন্যাসী	১৪
তৃষ্ণা	মাহবুব লীলেন	মাহবুব লীলেন	১৫
অণু- পরমাণু	মাশীদ আহমদ	মাশীদ	১৬
লাল- সবুজ মেশানো শাড়ির গল্প	মহিবুল কবির	পরিবর্তনশীল	১৭
বনসাই	মু. নূরুল হাসান	কনফুসিয়াস	১৮
মেহেদি রাঙা হাত	-	ধুসর গোধূলি	১৯
নিশি- নেশা	নজমুল আলবাব	নজমুল আলবাব	২০
দ্বিধা	অভ্র পথিক	ঝরাপাতা	২১
দৈনন্দিন	আনোয়ার সাদাত শিমুল	আনোয়ার সাদাত শিমুল	২২
প্রাগৈতিহাসিক	জ্যোতির্ময় বনিক	সবজান্তা	২৩
অবশেষে অরিন্দম...	অমিত আহমেদ	অমিত আহমেদ	২৪
বাথটাবে একা	জাহিদ হোসেন	জাহিদ হোসেন	২৫
আফসোস	লুৎফুল আরেফীন	লুৎফুল আরেফীন	২৬
কয়েকটি অণুগল্পের প্রচেষ্টা	সুমন চৌধুরী	সুমন চৌধুরী	২৭
বন্ধু	নিঘাত তিথি	নিঘাত তিথি	২৮
মায়িশার আম্মার সাথে দায়িত্বশীল দুপুর	হাসান মোরশেদ	হাসান মোরশেদ	২৯
ট্র্যাফিক সিগন্যালে একদিন	শাহরিয়ার মামুন	অতন্দ্র প্রহরী	৩০
তর্কপ্রগতির জন্য প্রকল্পিত একটি অসমাপ্ত সেমিনারের প্রতিবেদন	মুজিব মেহদী	মুজিব মেহদী	৩১
পুনশ্চঃ	-	নিঝুম	৩২
অস্তিত্বের অন্ধকার	শোহেইল মতাহির চৌধুরী	শোহেইল মতাহির চৌধুরী	৩৩
পথে	মুজিব মেহদী	মুজিব মেহদী	৩৪

বাবা আর কাঠগোলাপ গাছ

বিবাগিনী

বাবা যেদিন কাঠ গোলাপ গাছটা লাগিয়েছিলেন পেছনের উঠানটায়, সেদিন মা খুব রাগারাগি করেছিলেন। উঠানে রোদ পড়বে না। কাপড় বা আচার শুকানো যাবে না। স্যাঁতস্যাঁত করবে জায়গাটা। হাত খোপাটা খুলে আবার করতে করতে এমনতর অনেক গভীর সমস্যার কথা বলে যাচ্ছিলেন মা। মায়ের ঘামে ভেজা ফরসা মুখটা লাল হয়ে ছিলো রাগে। তিতলী প্রায়ই দেখেছে মা রাগ করলে খোপা খুলে আবার খোপা করেন বারবার। আড়চোখে একবার বাবার দিকে তাকিয়ে ছিলো সে। মায়ের কোনো কোথায় একটুও বিকার নেই তাঁর। মা'র মুখটা যত রাগী রাগী, বাবার মুখটা তত হাসি হাসি। যেন মাকে রাগাতে পেরে কি এক মজা পাচ্ছিলেন। মায়া মায়া কৃষ্ণবর্ণ মুখটা শিশুসুলভ সারল্যে ভরা। পাকা চুলগুলো খেয়াল না করলে কেউ বুঝতো না তাঁর তিতলীর সমান এতবড় একটা মেয়ে আছে। অবশ্য তখন তিতলীর নিজেকে যত বড় মনে হতো তার চেয়ে এখন সে আরো অনেক বড় হয়ে গেছে। কাঠগোলাপ গাছের খসখসে বাকলে হাত রেখে তিতলী উপরে তাকায়। পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ে চোখে মুখে।

'গাছটা কত বড় হয়ে গেছে তাই না মা?' পেছনে মা এসে দাঁড়িয়েছেন বুঝতে পেরে তিতলী বলে। মার শরীরে সবসময় এত সুন্দর একটা গন্ধ! না দেখলেও তিতলী মাকে চিনতে পারবে।

'এ ভরদুপুরে একা একা গাছতলে থাকতে হয় না। ভেতরে চলো। তোমাকে গোসল করাতে হবে। সবাই অপেক্ষা করছে। উফ আমার যে কত কাজ! এখনো ওদের বাড়ির মাছ দুইটা কাটা হলো না!' মায়ের একটানা বলে চলা কথাগুলো তিতলীকে কেমন যেন ঝাঁকুনি দিয়ে গেল। গাছের বাকলে রাখা নিজের মেহেদী পরানো হাত দুটা দেখলো তিতলী। কাঠগোলাপ গাছটাকে ছেড়ে যেতে হবে কালকেই। সেই ক্লাস ফোরে থাকতে বাবা মারা যাবার পর থেকে কেন যেন তিতলীর মনে হয় কাঠগোলাপ গাছটা বাবা হয়ে তিতলীকে আদর করে। ভর দুপুরে স্কুল থেকে ফিরে একটা বই নিয়ে উঠে যেত গাছের নিচের দিকের চারডালিটাতে। একদম বাবার কোলের মত আরাম। কতো কথা যে সে বলতো গাছটাকে চুপি চুপি। মা বকা দিয়েছে। স্কুলে ফার্স্ট হয়েছি। পাড়ার একটা বদমাশ ছেলে বিরক্ত করে। বুয়েটে চান্স পেয়েছি। কোন ডিপার্টমেন্টে ঢোকা যায়? মেকানিকালের ল্যাব এত কঠিন কেনো? যে ছেলেটারর সাথে বিয়ে ঠিক হলো সে কেমন যেন হাবলু ধরনের। এমন আরো কতশত কথা কাঠগোলাপ গাছটা জানে! তিতলী কি কথাগুলো আসলে বাবাকে বলে? ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে তার। দিন দু'টো কেটে যায় খুব তাড়াতাড়ি। বাড়ি থেকে প্রিয়াংকাতে যাবার আগে তিতলী বিয়ের সাজেই কাঠগোলাপ গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়ালো। গাছটাকে জড়িয়ে ধরে যখন কাঁদছিলো তিতলী, ওর বারবার মনে হচ্ছিলো ও বাবাকে ছেড়ে যাচ্ছে। হাতে করে একটা কাঠগোলাপ ফুল নিয়ে মার দিকে তাকালো তিতলী। মা কি বুঝতে পারে তিতলী কেনো এত ভালোবাসে গাছটাকে?

সময়টা কেমন যেন ঘোরের মধ্যে কেটে গেলো। সে এখন অন্য বাড়িতে, প্রায় অচেনা মানুষটার ঘরে তিতলী বসে আছে আড়ষ্ট হয়ে, হঠাৎ একটা চেনা সুবাস তিতলীর মাথা এলোমেলো করে দিলো। খোলা জানালাটার দিকে তাকিয়ে তিতলী অবাক হয়ে দেখে একটা কাঠগোলাপের গাছ উঠানটাতে। ফুলে ফুলে ভরা। ঠিক বাবার মত ছেলেমানুষী গলায় আসিফ বলে উঠলো, 'কী সুন্দর গন্ধ দেখেছো তিতলী? এই ফুলটা চেন?' তিতলী এই প্রথম আসিফের দিকে তাকালো ঠিক করে। মাথা নেড়ে হেসে বলল, 'হু চিনি, কাঠগোলাপ।' আসিফের মুখটা একদম বাবার মত হাসি হাসি হয়ে গেলো। তিতলী আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। গাছটাকে দেখে মনে হল, বাবা তাকে ছেড়ে যাবে না কোনোদিন।

বুক ভরে কাঠগোলাপের সুবাস নিতে নিতে তিতলী আসিফকে বললো, 'এখানে এসো, দেখো কী সুন্দর আকাশ ভরা তারা। একটুও মেঘ নেই আজ!'

ব্লগনাম / বিবাগিনী
এখন আছেন / ওয়েলস, যুক্তরাজ্য
যোগাযোগ / প্রকাশক মারফত

ক্লিনিক্যাল ডেথ

শেখ জলিল

সংসারে অশান্তি আর ঝগড়াঝাটি। আমার মায়ের দীর্ঘশ্বাস। বললেন, 'আর কইদিনই বা বাঁচমু! তখন আর তোদের ঝামেলা পোহাইতে অইবো না।' আমি তাঁর সংসারী ছেলে। দৌড়ে গিয়ে মায়ের বুকে ঝাঁপ দিয়ে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে পারি না। উচ্চস্বরে বলতে পারি না, ' মা, তোমাকে মরতে দেবো না কোনো দিন!'

শবে কদরের আগের দিন মা চলে গেলেন। যাবার সময় যথারীতি আমার মাথায় হাত রাখলেন। তাঁর প্রিয় নাতি, আমার একমাত্র ছেলেটির প্রতি খেয়াল রাখতে বললেন। এবার মা তাঁর নিজের মাথায় হাত বুলালেন। সম্ভবতঃ খুব মাথা ব্যথা। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মাথার চিকিৎসা তো করলি নারে, মাথাটা জানি কেমুন কেমুন করে!' আমি বললাম, 'বাড়ি থেকে ঘুরে আসো মা, ঈদের পর করাবো।'

ঠিক পাঁচদিন পর বড়ো ভাইয়ের ফোন। ঘুমের মধ্যে মা স্ট্রোক করেছেন। প্রচুর বমি হয়েছে, খিঁচুনী হচ্ছে। স্থানীয় ডাক্তার বলেছেন ব্রেইন স্ট্রোক। তাড়াতাড়ি জেলা সদর হাসপাতালে নেয়া হলো। কিন্তু আমার মন মানলো না। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনতে বললাম। প্রফেসর মজিদ স্যারের মাধ্যমে আগেভাগে ইমার্জেন্সীতে খবর দিয়ে রাখলাম।

যেদিন মাকে আনা হচ্ছিলো ঢাকায় সে রাতে ঘুম ছিলো না চোখে। একটু পরপর ভাইদের ফোন করি। মা'র অবস্থা জিজ্ঞেস করি। অজ্ঞান অবস্থায় আছেন মা। তবু মা'র বাম হাত-পা নাড়াচাড়া কতোটুকু জানতে চাই। কেউ ডাকলে অবশ্য বোঝেন মা। কথা না বললেও তার মাথায় এক হাত রাখেন। অ্যাম্বুলেন্স টঙ্গী পেরোয়। মা নাকি অনেকটা নিশ্চুপ হয়ে গেছেন। অ্যাম্বুলেন্স চলছে ঢাকা মেডিকেল অভিমুখে।

যখন বাসা থেকে মেডিকেলে পৌঁছাই তখন ভোররাত। বিছানায় শান্ত, নিশ্চুপ শুয়ে আছেন মা। মাকে ডাকি। একবার, দুবার, তিনবার। শেষ-মেশ বেশ জোরে-সোরে। কোনো সাড়াশব্দ নেই। মা চলে গেছেন কোন রাজ্যে? না, শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিকই আছে। সেই মায়াবী চেহারা থেকে স্নেহের জ্যোতি ঝরছে। হাতের চাবি দিয়ে পায়ের তালুতে ঘষা দেই, পাটা সরিয়ে ফেলছেন মা। ডিউটি ডাক্তার, নার্সকে ডেকে নাকে নল দিয়ে খাবার, ঔষধ দিতে বলি অচেতন মাকে।

ততোক্ষণে সিটি স্ক্যান রিপোর্ট চলে এসেছে। রাইট সাইডেড সেরিব্রাল ইনফারকশন। আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। বুকের ভেতর ভীষণ চাপ অনুভব করি। নিজেকে তবু ঠিক রাখি। আশে-পাশের ভাই-বোনকে সান্ত্বনা দেই। বাসায় এসে নিজেকে আলাদা করে ফেলি। একা একা নীরবে চোখের পানি ফেলি। আমার সময় দীর্ঘ হয়ে যায়। ঘড়িতে মিনিট-ঘন্টার কাঁটা খুব দেরিতে ঘোরে।

রাত দশটায় খবর আসে। ডাক্তাররা মায়ের ক্লিনিক্যাল ডেথ ঘোষণা করেছেন। মা আর জাগবেন না! যতোক্ষণ হৃদপিণ্ড, ফুসফুস চলবে ততোক্ষণ বোঝা যাবে মা বেঁচে আছেন। কিন্তু কথা বলবেন না কারো সাথে। কারো নাম ধরেও আর ডাকবেন না! আত্মীয়-স্বজন সবাই ছুটছেন। শেষবারের মতোন দেখতে যাচ্ছেন। বাসার ভেতর বদ্ধ রুমে আমি একা। আমার মন চায় না হাসপাতালে যেতে। অনেক মৃত্যুর সাক্ষী আমি। কারণ একজন ডাক্তার ছেলে হিসেবে মা'র এ খবরটা বুঝে গেছি অন্তত আরো বারো ঘন্টা আগে।

একাকী আমি ডুকরে কেঁদে উঠি, 'মা! মাগো!!'

ব্লগনাম / শেখ জলিল
এখন আছেন / ঢাকা, বাংলাদেশ
যোগাযোগ / sheikhjalil@hotmail.com

কপাল

মাহবুব আজাদ

ঘাম মুছতে মুছতে গাড়িটা ঠেলতে শুরু করলাম। আমার বউ মুচকি হাসি মুখে নিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি বিড়বিড় করে গুণতে থাকি। বাকিরা কিছু বলে না।

জেল থেকে মুক্তি পেয়েছি কিছুক্ষণ আগে। কসম, বেরোতে চাইনি এতো জলদি। বেরুলেই বউয়ের পাল্লায় পড়ে সর্বস্ব খোয়ানোর একটা সম্ভাবনা ছিলো।

একের পর এক রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছি। আপাতত স্টেশনের দিকে যেতে চাই। বউ হাই তোলে। বলে, 'জলদি করো!' মেজাজটা গরম হয়ে যায়। চুপচাপ গুণতে গুণতে ঠেলতে থাকি গাড়িটা।

স্টেশনে পৌঁছানো হয় না আমার। তার আগেই একটা হোটেলের সামনে থেমে পড়তে হয় আমাকে। ঝকঝকে লাল একটা হোটেল, তার নিচে লেখা, বন্ড স্ট্রীট। অনুভব করি, হেরে গেছি আবারও। নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে গেছি বহুবারের মতো। বউ হাসিমুখে হাত বাড়ায়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাড়িটা ঠেলে সরিয়ে দিই রাস্তার ওপর থেকে। তারপর টাকাপয়সা, জমির দলিল... সব তুলে দিই বউয়ের হাতে। মনে মনে ভাবি, সবার পরিণতিই কি আমার মতো হয় শেষ পর্যন্ত?

মুখে শুধু রাগ চেপে বলি, 'ধুর, আর যদি কখনো তোমাদের সাথে মোনোপোলি খেলতে বসছি তো আমার নাম অমুক-ই না!'

ব্লগনাম / হিমু
এখন আছেন / কাসেল, জার্মানি
যোগাযোগ / royesoye@gmail.com

আকাশ অবশ্যই সূর্যের চেয়ে বড়

গৌতম রায়

আমি জানি, শিরোনাম দেখে অনেকে তেড়ে আসবেন। যে তথ্য এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য, এই লেখার শিরোনাম তার বিরুদ্ধে। আপনি হয়তো বলবেন, সূর্যের আয়তন এত, পৃথিবীর আয়তন এত কিংবা পৃথিবীর চেয়ে সূর্য এত এত গুণ বড়। কিন্তু তারপরও আমার আসলে কিছু করার নেই। আমি আবারো বলছি, আকাশ অবশ্যই সূর্যের চেয়ে বড়।

আকাশ আমার বন্ধু, সূর্য তার তিন বছর বয়সী ছেলে। বয়সে বলেন, অভিজ্ঞতায় বলেন, উচ্চতায় বলেন, সবদিকেই আকাশ এখন সূর্যের চেয়ে বড়। আকাশ জানে, সূর্য একদিন সবদিক দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে যাবেই, কিন্তু সেটা আসতে ঢের দেরি। অনেক অনেক দেরি।

পৃথিবীর আকাশের চাইতে মহাবিশ্বের সূর্য অনেক বড়। আর আমার বন্ধু আকাশ বড় তার ছেলে সূর্যের চেয়ে। তাই আপনি-আপনারা যেমন ঠিক, আমিও তেমনি ঠিক। আমরা দু'পক্ষ শুধু নামটি ঠিক রেখেছি, আলাদা করে দিয়েছি নামের ভেতরকার বস্তু গুলোকে।

পাপন পরীকে ভালোবাসে, পরী ভালোবাসে পাপনকে। তাদের সবকিছুই ঠিক, শুধু ভালোবাসার সংজ্ঞাটা দু'জনের কাছে দু'রকম।

ব্লগনাম / গৌতম
এখন আছেন / ঢাকা, বাংলাদেশ
যোগাযোগ / gtmroy@gmail.com

এগারোটি রজনীগন্ধা

আহমেদ রাহিদ

সারারাত জেগে সকালে ওঠাটা খুব একটা সুখকর অনুভূতি না হলেও আর্ট কলেজের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে খুব একটা খারাপ লাগছিলো না সুমনের। পহেলা বৈশাখের উৎসব চারিদিকে। একটু আগেই চারুকলার ছেলেমেয়েরা আনন্দ মিছিল করতে বের হয়েছে। হরেক রকম মানুষ আর অনেক রঙের মাঝে হালকা ঠান্ডা বাতাসে বেশ একটা মাদকতাময় ব্যাপার আছে। গেট এর সামনে থেকে একটু সরে দাদুর দোকানের পাশে দাড়িয়ে একটা সিগারেট ধরায় সে। একটু নার্ভাস লাগছে আজকে। অনেকদিন ধরে যোগাযোগ থাকলেও আজকেই তার প্রথম দেখা হবে 'গোধূলি'র সাথে। বেশ কয়েকমাস আগে একটা সোশাল নেটওয়ার্কিং সাইট, ফেসবুকে গোধূলির সাথে পরিচয় হয় 'হুতুম প্যাঁচা' ওরফে সুমনের। পছন্দের গান, বই আর মুভিগুলাতে বেশ মিল পাওয়ায় ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠায় সে গোধূলিকে। এরপর আস্তে আস্তে শুরু হয় মেসেজ আদান প্রদান। অনেক ব্যাপারগুলোতেই দুজনের মধ্যে যে বেশ মিল, সেটা দুজনেই আবিষ্কার করে। প্রথমে দুজনেই ঠিক করেছিলো এই যে সম্পর্ক, সেটা বন্ধুত্ব হোক আর যাই হোক, হবে শুধুই ভার্চুয়াল। কোনো বন্ধন থাকবে না। কেউ কারো সাথে ছবিও শেয়ার করবে না, যাতে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলেও চিনতে না পারা যায়। ফেসবুকে এরকম আরো অচেনা বন্ধু থাকলেও দুজনই দুজনের প্রতি কেমন যেন একটা টান অনুভব করে। ব্যাপারটা নেশার মত হয়ে যায় একসময়। বাসায় কম্পিউটার একটাই থাকায় সেটার দখল নিয়ে পিঠাপিঠি বোনের সঙ্গে বেশ একটা ঝগড়ার মতোই হয়ে যায়। পড়াশোনায় প্রচন্ড সিরিয়াস ফারিয়াকেও ইদানিং দেখা যায় ফেসবুকে পড়ে থাকতে, কিন্তু প্রশ্ন করলে কখনোই তার নিক কি সেটা বলবে না। নিশ্চয় কোনো ছেলের সাথে ঠাট্টা করে; ভাবে সুমন। দুই ভাই বোনের অবস্থা দেখে মা শেষ পর্যন্ত আরেকটা কম্পিউটার কিনে দিতে বাধ্য হন। যদিও সুমনের ইচ্ছা ছিলো মায়ের ল্যাপটপটা নেয়ার, কিন্তু অফিসিয়াল কিছু স্পর্শকাতর ডকুমেন্ট থাকায় সেটা আর সম্ভব হয়নি।

এরকম চলতে চলতে সুমন একদিন হঠাৎ গোধূলির সাথে কথা বলতে চায়। গোধূলি প্রথমে রাজি হয় না। অনেকটা জোরাজুরি, খানিকটা অভিমান আর তিন দিন ফেসবুকে লগড আউট থাকার পরই ঠিক করে, কথা না, দেখা হবে সামনা সামনি। দিন ঠিক হয় পহেলা বৈশাখ।

কথা মতো গোধূলি পড়বে সবুজ শাড়ি-লাল টিপ, হাতে থাকবে এগারোটি রজনীগন্ধা আর সুমন পরবে নীল পাঞ্জাবী, হাতে থাকবে এগারোটি সাদা গোলাপ, ওদের পরিচয়ের এগার মাস। সময় সকাল নয়টা।

একটু পরপর হাতঘড়ির দিকে তাকার সুমন। অস্থির লাগছে তার। নয়টা বাজতে এখনো মিনিট পনেরো বাকি। কি হবে কে জানে!

'কি ব্যাপার, এত সকালে সাজগোজ করে কই যাচ্ছো?', বিছানায় আধশোয়া হয়ে 'দ্য ইকোনমিস্ট' পড়তে পড়তে স্ত্রীকে প্রশ্ন করেন জাফর সাহেব।

'আর বলো না, আমার পাগল বান্ধবীগুলা ঠিক করেছে আজকের সকালটা একসাথে নাস্তা করবে পান্তাভাত আর ইলিশ মাছ দিয়ে। যাবে নাকি? সুমন আর ফারিয়াও তো বের হয়ে গেছে।' সবুজ রঙের শাড়িটার পার ঠিক করতে করতে জবাব দেন রুবাবা, অফিসে সবার প্রিয় রুবাবা ম্যাডাম।

'নাহ', জাফর সাহেরের নিস্পৃহ জবাবটা আগে থেকেই আঁচ করতে পেরে আর কথা বাড়ান না রুবাবা। টেবিলে রাখা চায়ে দুই চুমুক দিয়েই নিচে নামেন।

'রমনা পার্কের দিকে যাবো ম্যাডাম?'

'হ্যাঁ। আর শোনো, যাবার সময় একটু আর্ট কলেজের সামনে দিয়ে যেও তো।' লাল টিপটা ঠিক করতে করতে জবাব দেন রুবাবা।

মোড়ের কাছে গাড়িটা দাঁড়াতেই ফুলওয়ালা মেয়েটা দৌড়ে আসে, 'রজনীগন্ধা নিয়ে যান আম্মা, আর এগারোটাই আছে।'

ব্লগনাম / অমিত
এখন আছেন / ক্যালিফোর্নিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
যোগাযোগ / amit024@gmail.com

পলাতক গদ্যগ্রহ

ফকির ইলিয়াস

ধূসর রঙটা লোকটির খুব পছন্দের ছিলো নিশ্চয়ই। না হলে ঐ রঙের পরিধান নিয়ে সে সমাহিত হতে চাইবে কেন? ভাবতে ভাবতে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় রায়ীফ। ধূসর আরমানি স্যুট, একই রঙের টাই, ধূসর রঙের জুতো, পরিয়ে লোকটিকে কফিনে রাখা হবে। তারপর সমাধিস্থ করা হবে নির্জন গোরস্থানে। এই কল্পদৃশ্য গুলো ঘুরপাক খেয়েছে তার মনে কাল সারারাত।

মেয়েটি খুব দ্রুত এসেই জানতে চেয়েছিলো, ধূসর রঙের কোনো স্যুট পাওয়া যাবে কি না। রায়ীফ কিছু বলার আগেই মেয়েটি তা তুলে নিয়েছিলো শোকেস থেকে। সাথে এক জোড়া বস্টনিয়ান জুতাও।

রায়ীফ জানতে চেয়েছিলো, ট্রাই করতে হবে কি না। মেয়েটি বলেছিলো, 'না তার প্রয়োজন হবে না। সাইজ ফোরটি টু হলেই চলবে। আর সু সাইজ টেন।' তারপর মেয়েটি সবকথা বলে যাচ্ছিল নিজের থেকেই, 'কাল আমার বাবা মারা গেছেন। তার জন্য কিনছি এসব। আজ বিকেলেই তাকে সমাধিস্থ করা হবে। আমি চাই সবকিছু দ্রুত সম্পন্ন হোক।'

মেয়েটির কথা শুনে সমব্যথী হয় রায়ীফ, 'ভেরি সরি টু হিয়ার দ্যাট'।

মেয়েটি কথা বলেই যায়, 'জানো আমার বাবার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একটি ইতিহাসের যবনিকা ঘটলো। আর কেউ আমাকে নাৎসীর মেয়ে বলে গালি দিতে পারবে না। বলেই মেয়েটি হু হু করে কেঁদে উঠে। রায়ীফ কিছু বোঝার আগেই মেয়েটি নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে, 'না, না, আমি ভুল বলছি। ওসব কিছু না।' বলেই মেয়েটি মূল্য পরিশোধ করে দ্রুত গাড়িতে গিয়ে উঠে পড়ে।

এর মাঝে পার হয়ে গেছে একমাস সময়।

'মে আই সিট নেক্সট টু ইউ প্লিজ?' কথাগুলো শুনে চমকে উঠে রায়ীফ। সেই মেয়েটি। যে ওই দিন তাদের স্যুট ওয়ারহাউস থেকে স্যুট, জুতো কিনেছিলো। কুশল বিনিময় করেই মেয়েটি কথা বলতে শুরু করে, 'তোমার কি সময় হবে?' রায়ীফ আগ্রহ নিয়ে তাকায়। পূর্ব পরিচয় নেই। তারপরও মেয়েটি এতো ঘনিষ্ট হতে চাইছে কেন? রায়ীফের আগ্রহে ভাটা পড়ে না। মেয়েটি কথা বলেই চলেছে, 'তোমাকে আমার কথাগুলো পুরো বলা হয়নি। তুমি কি শুনবে?'

রায়ীফ মৃদু হেসে বলে, 'তুমি চাইলে অবশ্যই শোনাতে পারো।'

মেয়েটি শুরু করে, 'জানো, আমার পিতা পলাতক থেকেই শেষ পর্যন্ত মরতে পেরেছেন। কেউ জানতে পারেনি তিনি আসলে কে ছিলেন!'

'এটা কি ধরনের কথা?' রায়ীফ জিজ্ঞাস করে।

মেয়েটি আবার শুরু করে, 'আমি যখন দু'মাসের, তখন আমার মা মারা যান। আমার পিতা ছিলেন নাৎসীবাদের সমর্থক এবং নাৎসী সৈনিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর জার্মানি থেকে পালিয়ে তিনি যুগোশ্লোভিয়া চলে যান, আমাকে নিয়ে। নাম ঠিকানা পরিবর্তন করেন। এমন কি নিজের বেশভূষাও। তারপর সেখান থেকে চলে আসেন যুক্তরাষ্ট্রে। এখানে এসে নামধাম পরিবর্তন করে অভিবাসনের জন্য দরখাস্থ করেন। নিয়ে নেন নাগরিকত্বও। এভাবেই চলতে থাকে তার জীবন। সবসময় তার ভয় ছিলো একটিই, কেউ যেন তার আসল পরিচয়ে জানতে না পারে। আমি তার ডায়েরি পড়ে জেনেছি এসব। শেষ বয়সে এসে আমাকে বলেছেনও কিছু কথা। তার ভয়ের প্রধান কারণ ছিলো, আসল পরিচয় বেরিয়ে পড়লে যদি জেলে যেতে হয়! সে ভাগ্য তাকে বরণ করতে হয়নি। ভূয়া পরিচয়েই মরতে পেরেছেন তিনি।' মেয়েটি থামে।

'তোমাকে যে এতোসব বললাম, তুমি আবার আমায় ভুল বুঝবে না তো?' রায়ীফ আনমনা হয়ে চেয়ে থাকে। সে ভাবতে থাকে অনেক কিছু। সব মানুষ কি সব সময় নিজের সঠিক পরিচয় দেয় কিংবা দিতে পারে? প্রকৃতপক্ষে জীবনের কাছে সবাই তো পলাতক! পিতার অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে রায়ীফের মা'ও একদিন হয়ে পড়েছিলেন প্রায় মানসিক ভারসাম্যহীন। তারপর ছোট্ট রায়ীফকে নিয়ে অনেকটা পালিয়েই চলে এসেছিলেন এই মার্কিনী অভিবাসে।

মেয়েটি রায়ীফের হাত চেপে ধরে, 'তুমি এসব কাউকে বলবে না তো?'

রায়ীফ 'না' সূচক মাথা নাড়ে।

আরেকটি পলাতক গদ্যগ্রহ দুজনের পাশ ঘেঁষে পৃথিবীর প্রান্ত ছুঁয়ে যায়।

ব্লগনাম / ফকির ইলিয়াস
এখন আছেন / নিউ ইয়র্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
যোগাযোগ / oronik@aol.com

তেপান্তর

কৌশিক দে

খিলখিলিয়ে হেসে পিন্টু উঠে এলো বিছানায়। রফিক সাহেব চমকে বললেন, 'তোর হাতে কী রে? দেখি!'

পিন্টু তাঁর একমাত্র নাতি। ক'দিন পরেই স্কুলে ভর্তি হবে। রফিক সাহেব কাগজটা একটু খুলেই অবাক হয়ে যান, ' পিন্টু, এটা কই পেলি রে?'

'দিদু দিলো, তোমার ড্রয়ার থেকে।'

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তাঁর স্কুলে থাকতে কাঁচা হাতের কাজ। তাঁর অনেক প্রিয় একটা ছবি। ধু-ধু তেপান্তর মাঠ, কালচে নীল আকাশ, তারাজ্বলা ছাদের নিচে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে দুই যুবক। মিত্র মজুমদার মশাই-এর বিখ্যাত দুই সৃষ্টি, নীল কমল আর লাল কমল। কাছে গাছটার উপরে বসে তা দেখছে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী।

'বুঝলে দাদু, দিদু বলছিলো... অদ্ভুত সব গল্প! রাজকুমার, তার সৎ মা একটা রাক্ষসী। ওরা কত জায়গায় যায়, তেপান্তরের মাঠ পেরোয়। আমি বলি, ধ্যাত মিথ্যা কথা। তখন দিদু এই ছবি বের করে দিলো। বললো, তুমি নাকি ওদের তেপান্তরের মাঠে দেখেছিলে। তখনি নাকি এঁকেছিলে ছবিটা। সত্যি দাদু?' রফিক সাহেব একটু হেসেই দ্রুত তা লুকিয়ে ফেললেন, 'দেখেছিই তো! সে এক অদ্ভুত জায়গা, শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে না! আমিই ওদের পক্ষীরাজ ঘোড়াটা ধরে দিয়েছিলাম।' পিন্টুর চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। একটা সন্দেহের হাসি দিয়ে বলে, 'এহ! মিথ্যামিথ্যি!' রফিক সাহেব পিন্টুর কথায় হেসে উঠেন। চোখ টিপে বলেন, 'বিশ্বাস না করলে নাই!'

রফিক সাহেব অসুস্থ। এটা তার সেকেন্ড অ্যাটাক। কাল থেকে হাসপাতালে তিনি, অনেক ধকল গেছে। আজ অনেকটা সুস্থ বোধ করছেন। সকাল থেকে লোকের ভীড়, সাংবাদিকরা তার দেখা না পেয়ে তার ছেলে ছেলে-বউয়ের সাথে কথা বলে গেছে। ভোরে জ্ঞান ফিরলে রফিক সাহেব প্রথমেই দেখেন তার স্ত্রী শিরিনকে। তিনি আদর করে ডাকতেন কলাবতী। শিরিন তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলছিলো, 'এখন কেমন আছো?' তিনি বলেছিলেন, 'ভালো।'

রাত নয়টা। রফিক সাহেব শুয়ে আছেন। উপরে অপরিচিত সিলিং। তাতে সারা জীবনের হিসাব মিলাতে চেষ্টা করেন। বয়স তার পয়ষট্টি। বাংলাদেশী হিসেবে গড় আয়ু পেরিয়ে গেছেন কবেই। সারাজীবন করে গেছেন কল্পনার আঁকিবুকি, কল্প-আঁকিয়ে হিসেবেই নাম-ডাক তাঁর। তাঁর আঁকা 'পৌরাণিক' সিরিজ জগৎ বিখ্যাত। কবে মনে করে রেখেছিলেন আবার শুরু করবেন ঠাকুরমার ঝুলি থেকে, করা হলো না। ছবিটা রেখে গিয়েছিলো পিন্টু। নিয়ে খুলে ধরলেন শুয়ে থেকেই। সব শুরু হয়েছিলো এই ছবিটি থেকে। কী অদ্ভুত! রফিক সাহেব ভাবতে থাকেন, আমরা কি শুধুই কল্পনা করি? কল্পনাতে বিশ্বাস করি না? পিন্টুরা কি আর স্বপ্ন দেখে না? তাঁর মনে পড়ে, কিভাবে গোগ্রাসে গিলতেন তিনি গল্পগুলি, ছবি হয়ে ভাসতো সব চোখ বুজলেই। যখন খুশি পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে বসতেন। কখনো বা নিজেই পক্ষীরাজ হয়ে, ডানা ঝাপটে চেয়ে দেখতেন নিচের সরে যাওয়া খাল-বিল। ঝুম দুপুরে পুকুরে ডুব দিয়ে এক শ্বাসে তুলে আনতেন প্রাণ-ভোমরার কৌটা! রাতে সব ঘুমিয়ে পড়লে, নীলচে আকাশের তলে পেরুতেন পুব-চরের তেপান্তরী সীমানা। রফিক সাহেবের চোখ ভিজে উঠে। তাঁর ডুবুডুবু চোখে ভাসতে থাকে তারাময় তেপান্তর ।

পাঁচ বছর কেটে গেছে। রফিক সাহেবের কবর জিয়ারত করে সবাই চলে গেছে যে যার বাড়ি। শিরিন এইদিন কারো সাথে দেখা করেন না, উপরেই থাকেন নিজের ঘরে। মাঝে মাঝে তার সাথে থাকে শুধু পিন্টু। শিরিনের হাতে রফিক সাহেবের তেপান্তরের ছবি। যেখানে দূরে ছুটে চলে কমল ভাইয়েরা, গাছে বসে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, আর একটু পিছনে, লাল জামা পড়া কোকড়া চুলের এক কিশোর পাশে দুধসাদা ঘোড়া নিয়ে তাকিয়ে থাকে সেই পথে, একটু পরে যেন সেও ছুটবে পিছু পিছু। পিন্টু জানে, এই ছেলেটা কে!

ব্লগনাম / খেকশিয়াল
এখন আছেন / ঢাকা, বাংলাদেশ
যোগাযোগ / no_one726@yahoo.com

হাতিসোনা

মাহবুব আজাদ

আমার বয়স তখন আট, ওর নয়। আমি টিংটিঙে রোগাপাতলা বালক, আর ও একটা ফুটবল। টলটলে চোখ, রেশমের মতো চুল। মিষ্টি একটা ফুটবল। আমাদের পাশের বাড়িতে নতুন ভাড়াটে। মেজদা এসে শিখিয়ে গেলেন, 'ওকে হাতিসোনা বলে ডাকিস। খুশি হবে।' সার্বিক বিবেচনায় আমার কাছেও দারুণ মনে হলো নামটা। হাতিসোনা ছাড়া আর কিছুই ডাকা উচিত না ওকে।

সেদিন বিকেলেই খেলার মাঠে বুক ঠুকে এগিয়ে গেলাম। 'হাতিসোনা, তুমি ক্রিকেট খেলবে আমাদের সাথে?' ওর নরম মুখটা কষ্টে লাল হয়ে গেলো। 'আমাকে হাতি ডাকবে না!' চেঁচালো সে মিহি গলায়। আমি মিষ্টি করে হাসি। কিন্তু পল্টু, নাসিম, কণিকারা সবাই হুঙ্কার দিয়ে উঠলো টিপু সুলতানের মতো, 'হাতিসোনাআআআআআআআআ!' কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে গেলো ও। ওরা আরও বছর আটেক ছিলো আমাদের পাশের বাড়িতে। আর একটা দিনও খেলতে আসেনি।

সেদিন দেখা হলো ওর সাথে। বই কিনতে গিয়েছিলাম, পাশের ছোট্ট পেস্ট্রির দোকানটায় ও আর ওর মা বসে কফি পানে ব্যস্ত। মেজদা থাকলে হয়তো আরেকটা খারাপ কথা শিখিয়ে দিতো, কিন্তু সত্যি বলতে কি, এমন চমৎকার ইয়ে, যাকে বলে দেহবল্লরী বহুদিন চোখে পড়েনি। মরাল গ্রীবা। গ্রীবার নিচে বহুদূরের বর্ণনা বাদ দিয়ে সরাসরি চলে যাচ্ছি মৃদু কটিদেশে, তারও নিচে... না থাক।

সরাসরি এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'ফারজানা, কেমন আছো?' ওর মা হাসলেন, 'কেমন আছো বাবা?' ও থমথমে মুখে উঠে দাঁড়ালো। তারপর ঝাড়া চব্বিশ মিনিট বকলো আমাকে। কিভাবে আমি ওর শৈশবের মিষ্টি বিকেলগুলো নষ্ট করেছি হাতিসোনা ডেকে, তারই করুণ ফিরিস্তি।

শুনে আমারও চোখে পানি চলে আসার যোগাড়। 'তুমি একটা দুষ্টু লোক! আর কখনও কথা বলতে এসো না আমার সাথে।' ফারজানা হাঁপাতে থাকে। আমি ঢোঁক গিলি।

মেজদাকে শুধু বাড়ি ফিরে বললাম, 'হাতিরা ভোলে না।'

ব্লগনাম / হিমু
এখন আছেন / কাসেল, জার্মানি
যোগাযোগ / royesoye@gmail.com

দুই পাহাড়

ইশতিয়াক রউফ

বাতাসটা হিম-শীতল না হলেও কিছুটা অস্বস্তিকর। মার্চের শেষ। বসন্তের বাতাস বইছে। বসন্ত বলেই হয়তো বাতাসে জোর করে আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছে সবাই। তুষারপাত থেমে গেলেও শীতের প্রকোপ কমেনি। আজকের বাতাসটা উত্তুরে না। সাথে বয়ে আনা কাঁপুনিটা শীতের নয়, ভয়ের। এয়ারপোর্টের চারিদিকে পাহাড়। মাঝের ছোট্ট সমতলটায় এই আঞ্চলিক বিমানবন্দরটা তৈরি। দিনে গোটা বিশেকটা প্লেন আসে-যায়। বাতাস যেন পাক খাচ্ছে পাহাড়গুলোর মাঝে। একদিকে হেলে পড়তে চাচ্ছে অনুভূতিগুলো। ইন্দ্রিয়গুলোর বিবাদ-ভঞ্জন হচ্ছে না শত চেষ্টায়ও।

উত্তরের পাহাড়টা কেমন যেন বিবর্ণ। শীতের শুরু থেকে তার গা বেয়েই হিমের সমুদ্র নেমে এসেছে। কী বিচিত্র, বিকৃত এক আনন্দ ছিলো সবার নজরে আসতে পারার। সবাই দক্ষিণের বাতাসের কথা বলে, পূবের সূর্যের কথা বলে, পশ্চিমের প্রগতির কথা বলে। উত্তরকে কেউ ভাবে না। না, রাগের মাথায়ও না। অন্তরের ভেতরের অন্ধকার অন্তরীক্ষে জমিয়ে রেখে, পুষে, পেলে, সযত্নে সাজিয়ে এই রাগের উপশম করতে হবে। পৃথিবীর প্রাণ শুষে গজানো পাতাগুলো ঝরলে ঝরুক। পিঁপড়ার খাবার আমার মাথাব্যথা না। আলোর অধিকার আমারও। আমি ভাগ চাই। স্মৃতি না, চিন্তায় স্থান চাই।

দক্ষিণের পাহাড়টা তুলনায় অনেক সজীব। শীতের হাজারো দাপট উপেক্ষা করেও কীভাবে যেন টিকে আছে। দিনক্ষণ মিলিয়ে যেন ফুল ফুটেছে। লম্বা শীতের পর আচমকা জেগে উঠছে সাদা সাদা ফুলগুলো। আশে-পাশে এখনও কেউ কেউ বিষন্ন মনে, বিবর্ণ দেহে দাঁড়িয়ে। নিজের প্রাণের বাতাসটুকু অন্যের প্রাণ ভরাতে বিলিয়ে গেলাম, তবু আমাকেই ঘৃণা, হিংসা। নিঃস্বতা মেনে নিয়ে বারে বারে সমর্পণ করি। নিজের ভেতরেই তোলপাড় করি তীব্র শীতের হিমে। আমার হ্যাংলা, নিষ্প্রাণ পটে কত কষ্টে চেরি ফুটছে। নাহ, কেউ নামও জানে না। তবুও ফুটুক। আনন্দের মাঝে বিলীন থাকাই দুঃখ লুকাবার শ্রেষ্ঠ জায়গা।

'এখানে দেখবো ভাবিনি। ঘুরতে এসেছি। এক বন্ধুর সাথে। থাক, এভাবে বলার তো মানে নেই। ওকে তো চেনোই।'
'হু, খুব মনে আছে। অনেক শুভেচ্ছা রইলো। সুন্দর জায়গা। ভালো লাগবে।'

আজও স্থিতি এলো না। তবু হয়তো ওরকম প্রাণময়, চঞ্চল হতে পারলে ভালোই হত। একবার যদি পাছে লোকে কিছু ভাবার ভয় না করে বড় করে দম নিতে পারতাম, একটু ছড়িয়ে বাঁচতে পারতাম।

মনের বরফ বাইরে গলবার আগে ভেতরে গলে। হয়তো আনন্দটা শুধুই ওপরে। হয়তো না, ওপরেই। ভেতরে গলতেই হবে। তবুও একটা খোলস দাঁড় করাতে পারলে মন্দ হত না। জীবনটা গোছানো হত, ব্যথাগুলোও গণ্ডিতে আটকা থাকতো।

ব্লগনাম / ইশতিয়াক রউফ
এখন আছেন / ভার্জিনিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
যোগাযোগ / ishti.rouf@gmail.com

টান

মোহাম্মদ আবদুল মুকিত

প্রতিবারই ঢাকা থেকে যেদিন ক্যাডেট কলেজে ফিরে যাই, মনটা ফুরফুরে থাকে। একেকটা ছুটি বেশ লম্বা, ছুটি কাটাতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠি। কলোনীর বন্ধু-বান্ধবদের আগের মতো ভালো লাগে না, কলেজের বন্ধুদের মতো 'পশ' না ওরা। কিন্তু এবার সকাল থেকেই কেমন যেন মনটা ভালো নেই। প্রতিবারের মতো আজও মা সকাল থেকে ব্যস্ত, আমার পছন্দের খাবার, গরুর কাবাবের ঘ্রাণ পাচ্ছি রান্নাঘর থেকে।

ব্যাগ হাতে বেরুতে বেরুতে হঠাৎ চোখ গিয়ে পড়ে দরজার কড়াটার উপর; আনমনা হয়ে যাই। ছোটবেলায় রোজ দুপুরে বাবার আসার অপেক্ষায় থাকতাম, কড়া নাড়া শুনেই বুঝে ফেলতাম বাবা এসেছে। মা'র কড়া নাড়াটাও বুঝতে পারতাম, আপুদেরটাও, ভাইয়ারটাও। অদ্ভুত! একেকজন এককেভাবে দরজার কড়া নাড়ে। আমারটাও নিশ্চয়ই অন্যেরা বোঝে। প্রতিবার আমি কলেজে যাওয়ার সময় মা সিঁড়ির নীচ পর্যন্ত গিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসে, মা'র চোখ ছলছল করে। আচ্ছা, মাও নিশ্চয়ই আমার কড়া নাড়া থেকে বুঝে ফেলে, 'বাবু এসেছে!' নিজের কড়া নাড়ার শব্দটা রেকর্ড করা গেলে ভালো হতো। দরজার কড়াটাকে আনমনে নাড়াতে থাকি, বেরুতে ইচ্ছে করছেনা। হঠাৎ মেজো আপু মিটিমিটি হেসে বলে, 'কিরে পাগলা, কড়া নাড়ছিস কেন?' আমি লজ্জা পাই। নাহ, এখন বেরুতে হবে।

কলোনীর গেটের কাছে আজিজ মিয়ার দোকানের সামনে ভাইয়া গাড়ি থামায়, সিগারেট কিনবে। গাড়ির কাঁচ ভেদ করে চোখ পড়ে আজিজ মিয়ার দোকানের সামনে সাজানো ছোট ছোট বয়ামগুলোর উপর। এই বয়ামগুলোকে ঘিরে কেটেছে আমার শৈশব, পালা করে একেক বার একেকটা বয়ামের জিনিস কিনতাম। বাবুল বিস্কুট, সুপার বিস্কুট, চিনির গোল্লা, সন্দেশ, বাবল গাম, আরো কত কি! বুকটা কেন জানি হু হু করে উঠে। বুঝতে পারছি না, কেনো এবার এত খারাপ লাগছে। আজিজ মিয়ার ছেলেটা আমাকে দেখে হাত জাগিয়ে বলে, 'বাইয়া, আবার যাইতেছেন?' ভিআইপিদের মতো হাতটাকে একটু উঠিয়ে মুচকি হাসি।

সামনের সীটে বাবার দিকে চোখ পড়ে, একমনে লিখে যাচ্ছেন হিসেবের খাতায়। সরকারী চাকুরে, রিটায়ারমেন্টের পর একটা ছোট থাকার জায়গা করে নেবেন নিজের আর সন্তানদের জন্য। এটাই তাঁর স্বপ্ন। শুনেছি ভাইয়া শান্তিনগরে বাসা ভাড়া করেছে, খুব সুন্দর। আপুরা দু'জনই ভীষণ উত্তেজিত, খুব চমৎকার বাসা! মাও খুশী। বাবার সেদিকে কোনো খেয়াল নেই, তার একটাই চিন্তা, নিজের ছোট একটা বাড়ি। কলোনীর গেটের উপরে বিশাল ব্যানারে লেখা, 'আরশাদ ভাই এলাকার সবার...', আর পড়তে পারি না, গাড়ি বেরিয়ে যায়। পুরোটা পড়তে না পারার আক্ষেপটা অনুভব করি। আসলেই বুঝতে পারছি না এবার এত খারাপ কেনো লাগছে। অথচ এবার তো ভালো লাগার কথা, সাকিবের বড় ভাই হাভানা চুরুট এনেছে, সাকিব নাকি তিনটা মেরে দিয়েছে। জমজমাট মাস্তি হবে এবার।

কলেজে ফিরেও ভাল্লাগছে না। ব্যাচের বাঁদর গ্রুপের মধ্যমণি হিসেবে কলেজে ফিরলে জমজমাট কাটে। অথচ আজ হাভানা চুরুট পার্টিতে যাইনি, রুমে বসে পড়ার চেষ্টা করছি। সাবেতও আছে রুমে, ও পড়ার পাগল। হঠাৎ সাবেত জিজ্ঞেস করে, 'আঙ্কেলের রিটায়ারমেন্ট কবে রে?' 'এই তো, দু'মাস পর' বলতে বলতে নিজের অজান্তেই একটা ব্যথা বোধ করি কোথায় যেন! তখনই বুঝে ফেলি, কেনো মনটা বিষন্ন, কোন জিনিসটা পোড়াচ্ছিল আজ সারাদিন।

এরপরের ছুটিতে যখন ঢাকায় যাবো, তখন শান্তিনগরের নতুন বাসায় উঠবো, কলোনীর বাসাটায় আর যাওয়া হবে না। সেই বারান্দা, সেই ডাইনিংয়ের নেট অথবা ছোট্ট স্টোর রুমটা, আর বসা হবে না। আজিজ মিয়ার দোকানের বয়ামগুলোও আর দেখা হবে কিনা কে জানে! হঠাৎ বাসার কড়াটার কথা খুব করে মনে পড়তে থাকে।

ব্লগনাম / জ্বিনের বাদশা
এখন আছেন / ইয়োকোহামা, জাপান
যোগাযোগ / mukit_tohoku@yahoo.com

পাস ফেল

অলৌকিক হাসান

গত রাতে পার্টি শেষে আমি আর সে এই প্রথম একসাথে আমার বাসায় মরার মতো ঘুমালাম। সকাল ৮টায় মরার ঘুম ভেঙে গেলে দেখি - সে জেগে আছে। মরার মতো পড়ে থেকেই কাত হয়ে তার বাহুতে চুমু খেলাম। সে মৃদু স্বরে বলল, 'আমি যাই।'

আমি বললাম, 'রাতে কিন্তু তোকে কিছুই করিনি। একটা চুমুও খাইনি। ফিরেই সটান ঘুমিয়ে গেছি। তুই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস।'

সে বলল, 'হুমম, তুই পাস করেছিস।'

তাকে বাসে তুলে দিয়ে আসি। হেঁটে বাসায় ফিরতে ফিরতে ভাবি - মরার মতো ওই ঘুমটা না এলে গত রাতে আমি নিশ্চিত ফেল করতাম!

ব্লগনাম / অলৌকিক হাসান
এখন আছেন / প্রকাশে অনিচ্ছুক
যোগাযোগ / প্রকাশক মারফত

ম. লিপস্কেরভ এর 'লাভ স্টোরি'

সংসারে এক সন্ন্যাসী

স্ত্রী : আমি তোমাকে...
পুরুষ : আমিও তোমাকে...
স্ত্রী : 'আমি বহুদিন ধরে স্বপ্ন দেখে এসেছি এই দিনটির...
পুরুষ : এই জীবনে এর চেয়ে তীব্রভাবে আর কিছু চাইনি আমি...
স্ত্রী : তোমার সবাই রাজি হবে তো?
পুরুষ : আমার পক্ষের কাউকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। তোমার দিক থেকে কেউ বিরোধিতা না করলেই হলো...
স্ত্রী : আমার পক্ষের সকলে বহু আগে থেকেই রাজি...
পুরুষ : চমৎকার...
স্ত্রী : 'অবশেষে তুমি আর আমি...
পুরুষ : হ্যাঁ, চলো, যাওয়া যাক...
স্ত্রী : চলো...
তারা দু' জন চললো ডিভোর্সের কাগজপত্র জমা দিতে।

ব্লগনাম / সংসারে এক সন্ন্যাসী
এখন আছেন / কিয়েভ, ইউক্রেন
যোগাযোগ / real-nowhere-man@yandex.ua

তৃষ্ণা

মাহবুব লীলেন

অনীক

এই চিঠি তোকে পোস্ট করব না কিন্তু চিঠিটা তোকেই লিখছি আমি। এখানে যা বলতে চাই তা কোনোদিনও জানাতে চাই না তোকে

ডাক্তার বলেছে আমি বেঁচে আছি কিছুদিন পরে মারা যাবার জন্য। ...বুকে হাত দিয়ে বলতো - এই কথা শুনলে কি আমাকে তুই কথায় কথায় পেত্নি কিংবা কুত্তারাশি কিংবা কাউয়াকণ্ঠী বলতে পারতি? ...পারতি না। তুই ভাবতি - মেয়েটা মাত্র কয়েকটা দিন বাঁচবে; তাকে সব সময় প্রশংসা করা উচিত। আর জোর করে প্রশংসা করতে গিয়ে আমাকে বারবার মনে করিয়ে দিতি সেইসব কথা যা আমি মনে করতে চাই না মোটেও

হাসপাতালে সবাই আমার দিকে কেমন কেমন করে যেন তাকায়। আমার কী ইচ্ছে করে জানিস? ইচ্ছে করে সবাইকে চিৎকার করে বলি - ঔষধ নয়। তোমরা আমাকে মারো না হয় গালি দাও। তাহলে আমি রাগ করতে পারব। আর রাগ করতে পারলেই আমি ভুলে যাব যে আমার এই অসুখটা ভালো হবে না কোনোদিন

আমার মা বকাঝকা ভুলে গেছে। আমি ইচ্ছা করে জিনিসপত্র নষ্ট করি - ভাঙচুর করি। কিন্তু কিচ্ছু বলে না সে। বাবা তার পিত্তি জ্বালানো তাত্ত্বিক উপদেশগুলো এখন আর দেয় না। কেমন যেন ক্লাউনের মতো আচরণ করে। খামাখাই আমার সামনে হাসে আর লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে আমি হাসছি কি না

কিন্তু আমি কী করি জানিস?

আমাকে গালাগালি করে লেখা তোর চিঠিগুলো পড়ি। সারাক্ষণ। মায়ের ওষুধ-ডাক্তার হয়তো আমাকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু তোর গালিগুলো আমাকে ভুলিয়ে রাখে কেন মা আমাকে প্রতিদিন কয়েকশোবার উঁকি দিয়ে দেখে যায়। কেন বাবা আমার বেডে জোকসের বই রেখে যায়

তোর সবগুলো চিঠি আমার বালিশের নিচে রাখা। ঘুমের ভেতরেও ওগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে আমি রেগে উঠি - শুয়োরের বাচ্চা আমাকে কত্তো বড়ো গালি দিলো। এরপরে তাকে এমন গালি দেবো যে... আর তখনই ব্যস্ত হয়ে পড়ি তোকে দেবার জন্য গালি খুঁজতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে গালাগাল খুঁজি...

হয়তো একদিন তুই জেনে যাবি কোন কথাগুলো তোকে জানাতে চাইনি আমি। যখন জানবি তখন কি তুই আমাকে একটা ক্যান্সারের রোগী হিসেবে মনে রাখবি? নাকি মনে রাখবি সারাক্ষণ হৈচৈ করা - গালাগালি করা - হাতাহাতি করা এক হাড্ডি জ্বালানো ড্রাকুলা হিসেবে?

তুই প্রায়ই বলতি আমাকে নিয়ে স্ক্যান্ডাল লিখে পত্রিকায় ছাপিয়ে দিবি। প্লিজ লিখিস। এমনভাবে লিখিস যেন সেটা পড়ে সবাই আমাকে গালাগাল করে। লিখবি? পারবি এই চিঠি পড়ার পরও আমাকে গালি খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে? ...তুই একটা হরর নাটক লেখার কথা বলতি। বলতি সেই হররে একটা মেয়ে ড্রাকুলা থাকবে। যার নাম হবে লোপা

সত্যি করে বলতো অনীক; কী লিখবি আমাকে নিয়ে? স্ক্যান্ডাল - হরর নাকি এলিজি? আমি জানি আমাকে নিয়ে এলিজিই লিখবি তুই। যার অক্ষরে অক্ষরে থাকবে করুণা - দয়া আর সহানুভূতি। থাক। লিখিস না। কিছুই লিখিস না আমাকে নিয়ে। এলিজিতে মানুষ মানুষকে বড়ো বেশি করুণা করে। আমাকে করুণা করিস না তুই। তোর থেকে অনেক বেশি ধুরন্ধর আর ফাজিল; যার হাতে তোকে সব সময় নাস্তানাবুদ হতে হয় সেরকম শত্রু ভেবে মরার পরেও আমাকে তুই জেলাস করিস প্লিজ। আর আমাকে শায়েস্তা করার জন্য মনে মনে কখনও স্ক্যান্ডাল - কখনও হরর - কখনও ব্ল্যাকমেইলিংয়ের প্ল্যান করিস

আর যদি না পারিস। মনে করিস সিনেমা দেখতে গিয়ে সিনেমার পর্দাতেই কোনো একদিন আমাকে দেখেছিলি। যার নাম কিংবা চেহারা কিংবা ঘটনা কোনোটাই মনে নেই তোর

- তোর সেই লোপা

ব্লগনাম / মাহবুব লীলেন
এখন আছেন / ঢাকা, বাংলাদেশ
যোগাযোগ / leelen@gmail.com

অণু- পরমাণু

মাশীদ আহমদ

এই গল্পের কোনো শুরু নেই, শেষও নেই। আবার হতে পারে, এটা কোনো গল্পও না, একটা বিচ্ছিন্ন সংলাপ। যে সংলাপের শুরুটা হয়েছিলো খুব সাদামাটাভাবে, হয়তো অনেকটা এভাবে:

'আড়াইটা বাজতে আর দশ মিনিট। ক্যান যে ছাতার এই ভর দুপুরে ল্যাবগুলা করতে হয়! তাও মরার এত্ত লম্বা! তোর রিপোর্ট লেখা শেষ?' / 'হুম। ল্যাবে যাই চল।'

'ধুর! বিরক্তিকর! আবার কালকে ক্লাসটেস্ট আছে ম্যানুফ্যাকচুরিং প্রসেসের উপর, জানিস তো?' / 'জানি।'

সময়ের সাথে সাথে ব্যস্তানুপাতিকভাবে সংলাপগুলোর সাদামাটাত্বটা কমতে থাকে। তাই গল্পের মাঝে এসে এই রকমই কোনো এক ল্যাবের আগের সময়ের সংলাপ ছিল আরেকটু কম সাদামাটা, ধরে নিলাম অনেকটা এরকম:

'রিপোর্ট লিখেছিস?' / 'না।'

' আজকেও লিখিসনি! তোর সমস্যা কি, বল তো?' / 'কিছু না।'

'কার সাথে ঢং করে উনি ল্যাবে লাড্ডু খাচ্ছেন কে জানে! খামাখা এত পাট নিস কেন বুঝি না!' / 'তুই বুঝবি না।'

'তা বুঝব ক্যান! সব তো আপনি বুঝে বসে আছেন! কর, ফেল কর। আমার কী! তোর উপর আমার মাঝে মাঝে ভীষণ বিরক্ত লাগে, জানিস?' / 'জানি।'

ওরা যদি কোন রিয়ালিটি শো-এর নায়ক-নায়িকা হতো, তবে বলতেই হয় এর কিছুদিন পরে (মাঝে আরো নানা বিচ্ছিন্ন সংলাপ আর ল্যাব পেরিয়ে) শো-এর রেটিং বেশ বেড়ে যেতো। কারণ, অন্য কোনো দিনের বিচ্ছিন্ন সংলাপ অনেকটা এরকম:

'তুই আমার কাছে কি চাস বল তো?' / 'কিছু না।'

'তোকে আমার কিছুই দেবার নেই।' / 'জানি।'

'তাহলে আমার সাথে এরকম করিস কেন?' / 'বুঝবি না।'

'কিন্তু তারপরেও তোকে খুব দিতে ইচ্ছা করে কিছু... (তুই এবার জানিসও না বুঝিসও না) না সিরিয়াসলি আই মীন ইট। আই ফীল সো রেস্টলেস! / 'জানি।'

'আই গটা গিভ ইয়ু সামথিং। বিফোর ইটস টু লেইট... (তোর যাবতীয় জাগতিক বিষয় জানা-বোঝার তুখোড় ক্ষমতা কি সাময়িকভাবে আবারো লোপ পেলো?) কিন্তু আমার আসলেই তোকে দেবার কিছু নেই।' / 'হুমমম...'

'তুই একটা ইডিয়েট, এটা জানিস?' / 'জানি।'

'আচ্ছা, আমার হাতটা দিতে পারি তোকে। নিবি?' / 'হুমমম...'

'খুব সাময়িক চুক্তি কিন্তু। আবার ল্যাব ফাঁকি দিলেই ফেরত নিয়ে নেব, বুঝলি?' / 'জানি।'

'ধুর! তুই একটা ইরিটেটিং সবজান্তা! সেটা জানিস?'

(মুখে হাসি আর হাতে চাপ। আপাতত বিচ্ছিন্ন এই সংলাপটা ছিন্ন হয়ে যায়।)

এই গল্প আপাদতঃ এখানেই শেষ করে দেয়া যায়। আবার এর কিছুদিন পরে ওদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে একটু থেমে শুনেও দেখা যায় ওরা তখন কী বলছে। সাদামাটা থেকে রঙ-চঙা হয়ে কি স্যাচুরেশান লেভেল পার হয়ে গেল? না কি এখনো রঙিন? না হাত ছেড়ে দিয়ে অন্য কারো সাথে সংলাপ শুরু হল? এই জন্যই বলেছি গল্পটার অস্পষ্ট শুরুর মতোই কোন স্পষ্ট শেষ নেই। বিচ্ছিন্ন সংলাপ যতদিন চলবে, ততদিন গল্পটাও চলতে থাকবে। শুধু একেক সময় গল্পটা হবে একটা ল্যাব রিপোট, একটা কনসার্ট, একটা রেস্টুরেন্টে খাওয়া, একটা মুভি বা বই রিভিউ, একটা বিয়ে বা একটা ঝগড়া। এরকম একেকটা অণুগল্প- পরমাণুগল্প নিয়ে চলতে থাকে গোটা জীবনের উপন্যাস।

ব্লগনাম / মাশীদ
এখন আছেন / কুয়ালা লামপুর, মালয়শিয়া
যোগাযোগ / masheed.ahmad@gmail.com

লাল-সবুজ মেশানো শাড়ির গল্প

মহিবুল কবির

তাঁর সাথে আমার প্রথম দেখা ১৯৫২ সালের কোনো এক বৃহস্পতিবারে রোদ ফিকে হয়ে আসা বিকেলে। ঢাকা ইউনিভার্সিটির রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম, হঠাৎ তিনি আমার পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। আমি কিছুটা বিরক্ত হয়েই তার দিকে তাকালাম, 'কে আপনি?' সাদা রঙের একটা আটপৌরে শাড়ি পরা তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। একসময় ভেঙ্গে আসা কণ্ঠে বললেন, 'আমি তোমার মা!' আমি বেশ অবাক হলাম। আমার মা আমার জন্মের রাতে অন্য জগতে চলে গেছেন। যে জগতে গেলে মানুষ আকাশের তারা হয়ে তার সন্তানের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি বললাম, 'কী রসিকতা করছেন? আমার মা বেঁচে নেই...' তিনি বিষন্ন ভঙ্গিতে হাসলেন, বললেন, 'আমি তোমার দেশ। আমি তোমার মা। ওরা তোমাকে, আমাকে আমার ভাষায় গান গাইতে দেবে না। আমার ভাষায় হাসতে দেবে না। আমাকে তুমি রক্ষা করবে না?' সে বছর আমি তাঁর ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছিলাম। আমার মায়ের ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছিলাম। আমি বাংলা পেয়েছিলাম!

এই ঘটনার ঠিক ঊনিশ বছর পরে, এক ভয়ংকর রাতে, তিনি আমার কাছে আসেন। সেদিন তার সাদা শাড়িটা আরো বেশি আটপৌরে। আমি তাঁর মাথায় হাত রাখলাম, 'মা।' তিনি কাঁদলেন আর আমার হাত ধরে বললেন, 'বাবা, ওরা আমাকে কেড়ে নিয়ে যেতে চায়। তুমি আমাকে বাঁচাও! তুমি আমাকে বাঁচাও... ওদের কাছে বন্দী হয়ে থাকলে আমি মরে যাবো...' আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আমার শরীরে একটা বাঘের গর্জন শুনলাম। আমার মা বন্দী হয়ে থাকবে? তা কী করে হয়? মা'কে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করবো। তিনি বিদায় নেওয়ার আগে একটু হেসে বললেন, 'আমাকে মুক্ত করো। আমি এই সাদা শাড়ি কোথাও ফেলে দেবো! একটা লাল-সবুজ মেশানো শাড়ি পরবো আমি, তোমায় কথা দিলাম।'

ইদানিং তিনি আমার কাছে প্রায়ই আসেন। সেই সাদা শাড়ি পরা, সেই অগোছালো দুটি চোখ, সেই ভেঙে যাওয়া কন্ঠস্বর! আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, 'আপনি সাদা শাড়ি পরে আছেন কেনো? লাল-সবুজ শাড়ি কই?' তিনি কোনো কথা বলেন না। তাঁর কথা বলার শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে। আমি তাঁর কাঁধে হাত রাখি, 'মা, চুপ করে থাকবেন না। আপনি কথা না বললে আপনার সন্তানেরা যে অসহায় হয়ে যায়! তিনি আমার দিকে কান্না ভেজা চোখে তাকান। ভিজে যাওয়া এক কন্ঠে ধীরে ধীরে বলে ওঠেন, 'সেই লাল-সবুজ শাড়ি পরার বড় শখ আমার! অনেক অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে আমার! কিন্তু কী করে বলব? আমি যে এখনো মুক্ত হতে পারি নি!'

ব্লগনাম / পরিবর্তনশীল
এখন আছেন / গাজীপুর, বাংলাদেশ
যোগাযোগ / shopnogulo_tomar_moto@yahoo.com

বনসাই

মু. নূরুল হাসান

থোকা থোকা আগুন ভর্তি গাছটার নিচে মুখ অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে আছে সজীব। ছটফটে একটা ভঙ্গি ওর সারা দেহে, ঘড়ি দেখছে বারবার। শিলা আজ খুব বেশি দেরি করে ফেলছে - টিউশানীতে ঠিক সময়ে পৌঁছতে হলে সজীবের এক্ষুণি উচিৎ বাস ধরতে ছোটা। কিন্তু সে উপায় নেই। ক্লাস শেষ হওয়ার পরে এইটুকুই যা সময়, এখন চলে গেলে আজ আর দেখা হবে না।

শুরুতে অবশ্য এত ঝামেলা পোহাতে হতো না। ক-ইউনিটে পরীক্ষা দিয়ে এক সাবজেক্টেই পড়ছিলো দু'জনে, একসাথে। পরে মাইগ্রেট করে বিষয় বদলে শিলা চলে যায় অন্য ডিপার্টমেন্টে। আর তারপর থেকেই সজীবের রোজকার এই নতুন রুটিন, প্রতিদিন ক্লাস শেষে দু'পলকের এই দেখা!

আজ সকালে ছুটতে ছুটতে ক্লাসে যাবার সময় অবশ্য শিলাকে দেখেছে একটুখানি, কমলা রঙের একটা স্বপ্ন-স্বপ্ন জামা পড়ে রিকশা থেকে নামছিলো। কথা হয় নি, তার ক্ষতিপূরণ হিসেবেই যেন আজ ক্লাসের পুরোটা সময় ওর মাথা কমলা রঙে শুধু ডুবছিলো আর ভাসছিলো।

কার্জন হলের পাশ দিয়ে টুংটাং ঘন্টা বাজিয়ে ছুটে চলা রিকশা গুলোর চেয়েও দ্রুত গতিতে ছুটছে যেন ওর ঘড়ির কাঁটা। অল্প খানিকটা বাতাস দিচ্ছে, সেই হাওয়ায় মাথার ওপর থেকে টুপ করে খসে পড়ে একটা কৃষ্ণচূড়া, সজীবের কাঁধে ধাক্কা দিয়ে অভিমানী মেয়ের মতন মুখ গুঁজে পড়ে সে মাটিতে। মাথা নীচু করে ফুলটা তুলতে যেতেই চোখের কোনা দিয়ে দেখতে পায় সজীব, শিলা আসছে।

কাঁধের ওপর বইয়ের ব্যাগ ঝোলানো, বাম হাতে ওটা ক্লাসেরই কোন বই হবে, আর ডান হাতে শাহেদের হাত ধরা মুঠি করে।

শাহেদ, বায়োকেমিস্ট্রির ভালো ছাত্র, ক্রিকেট খেলায় নির্বিচারে চার-ছয় মেরে যায়, বড় বড় হাতের আঙ্গুল চেপে খুব জোরে বলও করতে পারে। আকাশে বল উঠে গেলে নিরাপদে লুফে নেবার জন্যেও এরকম হাতেরই কদর আছে, সবসময়।

যেতে যেতে সজীবকে দেখতে পায় শিলা। দূর থেকে হাত নাড়ায়, 'কি রে, টিএসসি-তে যাবি? সিনেমা দেখাচ্ছে ফিল্ম সোসাইটি!' মাথা নাড়ে সজীব, 'না রে, টিউশানী আছে, তোরা যা না, দ্যাখ গিয়ে।'

চলে যায় ওরা। ওদের রিকশা চোখের আড়ালে যেতেই জমে থাকা দীর্ঘশ্বাসটা মুঠো করে ধরে ফেলে সজীব, কৃষ্ণচূড়া ফুলটার গায়ে আদর করে বুলিয়ে দেয় সেটুকু। হাতের ইশারায় একটা রিকশা থামিয়ে তাতে চড়ে বসে সে, ভুরু কুঁচকে ভাবে - আজ বোধহয় দেরি হয়েই যাবে ওর।

ব্লগনাম / কনফুসিয়াস
এখন আছেন / মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া
যোগাযোগ / প্রকাশক মারফত

মেহেদি রাঙা হাত

ধুসর গোধূলি

বসন্তের আগমনী বার্তা নিয়ে এলো আরেকটি ব্যস্ত দিন। রিক্সার বেলের টুংটাং শব্দে ছাপিয়ে গেলো গ্রামের মেঠো সড়কটি। আশপাশের কয়েকটি বাড়ি থেকে শোনা যায় ইতস্তত হাঁকডাক, রান্নাঘর থেকে ওঠা ধোঁয়ায় রোয়া ধানের ভাতের ঘ্রাণ।

বেলা খানিকটা বাড়লে পশ্চিম পাড়ার আক্রমদ্দীন প্রধান প্রতিদিনের মতো আমির আলীর টং দোকানের বাঁশের ফলার বেঞ্চিতে বসে হাঁক দেয়, 'দেও দেহি এক কাপ ছা।' আমির আলী সর সরানো দুধ নিয়ে চা বানিয়ে এগিয়ে দেয়। চা বানাতে বানাতেই আরও কয়েকজন যোগ দেয় আক্রমদ্দীন প্রধানের সঙ্গে। সুন্দর আলী, মোন্তা ব্যাপারী, আফাজদ্দি মুন্সী, শব্দর আলী - একে একে এসে জড়ো হয় আমির আলীর টং দোকানের বাঁশের বেঞ্চিতে। মুরুব্বিদের এদিকে এ সময় জড়ো হতে দেখে কমবয়সীরা আর টং মুখো হয় না। মসজিদের কোণার শনি মুন্সীর দোকান থেকে কে-টু সিগারেট কিনে নিয়ে আড়ালে চলে যায়। সকালে আয়েস করে সিগারেটের সঙ্গে চা খেতে না পারার ক্ষোভে কয়েকজন জড়ো হয়ে বিড়বিড় করে অথবা অন্যকিছু নিয়ে কথা বলে। বয়স অনুযায়ী এরকম কয়েকটা জটলা দেখা যায় ছিন্ন ছিন্ন। সবাই বিড়বিড় করে! বাঁশের লাঠিতে ভর করে সাফি মেম্বার আমির আলীর টং দোকানে আসে। ঠিক তখনি টং দোকানের সামনে দিয়ে সাদা পলিস্টার কাপড়ের বাণ্ডেল বোঁঝাই একটা রিক্সা সাঁই সাঁই করে চলে যায়। রিক্সার পেছনের আর্ট করা সাইনবোর্ডে লেখা থাকে, 'ইয়াকুব পরিবহন, বিরতিহীণ, গোশাই আর্ট'।

মঙ্গলবার, হাটবার, ব্যস্তদিন। ভোরের ব্যস্ততা কেটে পিকআপ ভর্তি পুলিশ গ্রামে ঢুকে, পেছন পেছন ফাঁড়ির দু'জন কনস্টেবল নিয়ে একটা টেম্পো। তা দেখে কারও কোনো ভাবান্তর হয় না, কিংবা হলেও না দেখানোর ভান করে। পিকআপের পেছন পেছন ছিন্ন জটলাগুলো পরস্পর দূরত্ব বজায় রেখে এগোতে শুরু করে গ্রামের অন্যপ্রান্তে। শেষ জটলাটি খাল পাড়ের মজি মিয়ার বাড়ির কাছাকাছি যেতেই দেখা যায় রিয়াজুদ্দি হাজী'র ছেলে শাহীনকে তিনজন কনস্টেবল হাতে বেড়ি এবং কোমরে দড়ি লাগিয়ে পিকআপে তুলতে। দু'জন কনস্টেবল আর চারজন যুবক ধরাধরি করে চাটাইয়ে মোড়া একটা দেহ টেম্পোর পাটাতনে রাখে।

চাটাইয়ের শেষ প্রান্তে বের হয়ে থাকে হলদেটে এক জোড়া মেয়েলী পা। পা গুলো রত্নার।

মেঘনার বুকে সর্বস্ব হারানো পিতার পছন্দের পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার ঠিক পনেরো দিন আগে হলুদের রঙ শরীরে লাগার আগেই তার শরীর রাঙা হয় ছোপ ছোপ রক্তে। রত্না বিদায় নেয় মেহেদি রাঙা হাতের স্বপ্ন বুকে নিয়ে।

ব্লগনাম / ধুসর গোধূলি
এখন আছেন / প্রকাশে অনিচ্ছুক, জার্মানি
যোগাযোগ / dhushorgodhuli@gmail.com

নিশি- নেশা

নজমুল আলবাব

কবির তড়পাচ্ছে। কানের পাশ থেকে একটা ধারা গড়িয়ে যাচ্ছে দ্রুত। চিৎ হয়ে পড়ায় হাত দুটো ছড়িয়ে আছে। সিগারেটটা ছিটকে যায়নি। কানের পাশ থেকে যাওয়া রক্তের ধারা সিগারেট নিভিয়ে দিল। কবির আমার দিকে তখনও তাকিয়ে আছে। চোখে অবিশ্বাস। আসলে এভাবে কথা ছিলো না। আমরা আজ অন্য প্ল্যান নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু কবির নিজেই গোলমালটা লাগিয়ে দিল। আর এখন তড়পাচ্ছে। সে না তড়পালে হয়তো আমি তড়পাতাম। কিংবা বাদল নিজের রক্তে গড়াগড়ি খেত এতক্ষণে।

টাকা গুলো খুব সহজেই পাওয়া গিয়েছিল। লোকটার লুঙ্গি টান দিতেই উরুতে বাঁধা বান্ডিল বেরিয়ে পড়ে। ভয়ে কাঁপছিল। তবু অনুনয় করছিল হাত জোড় করে, 'বাবারা জমিন বেঁচার টেকা। মাইয়ার বিয়া দিতে হইব। জামাইরে নগদ ষাইট হাজার টেকা না দিলে বিয়া হইব না। আপনাগো আল্লার দোহাই আমার মাইয়ার বিয়াটা ভাইঙ্গেন না।' এইসব শুনে আমরা অভ্যস্ত। কোন বিকারই আর তৈরি হয় না ভেতরে। বাদল হাতের ছুরি আলসে এক ভঙিতে দুলিয়ে বলে, 'এই বুড়া বেশি কথা না বইলা হাঁটা দে। বাঁইচা থাকলে মাইয়ার অনেক বিয়া দিতে পারবি। এইখানে দাড়াইলে বাঁচনের চান্স খুব কম কিন্তু।' লোকটা তবু যায় না। কবিরের দিকে দৌড়ে যায়। তার হাতে তখন টাকার বান্ডিল গুলো খেলা করছে। আঙুলের ফাঁকে সিগারেট। 'বাবা গো দয়া করেন। শেষ সম্বল এই জমিন ছিল।' কবিরের লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষন। জিজ্ঞেস করে, 'সত্য বলতেছেন?' ধড়ে যেন প্রাণ আসে সেই মানুষটার, 'হ বাবা, মিছা কথা বলবো কেন?'

এসবের কোন মানে নেই। গল্পের সময় আছে নাকি হাতে। কবির হারামজাদার মনে ভাব আসছে কেন আল্লাই জানে। আমি তাড়া দেই। হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দেয়, 'আপনার পায়ে কি হইছে? খুড়ায়া হাঁটেন কেন?' 'গুলি লাগছিলো। মুক্তিতে ছিলাম। স্বাধীনের আগের দিন এই পায়ে গুল্লি লাগলো...' কবির সাদা সাদা চোখ করে তাকায় দেখি সেই লোকের দিকে। তারপর আচমকা টাকা গুলো তুলে দেয় তার হাতে, 'আপনি যান।'

আরে হারামজাদায় করে কি? আমি চিৎকার করে উঠি, 'এই কবির কি করিস? এই বেটা এই...' বাদল দৌড়ে যায় লোকটার সামনে। টাকা ছিনিয়ে নিতে যাবে এমন সময় হুঙ্কার দেয় কবির, 'এই শুয়রের বাচ্চা থাপড়ায়া মুখের নকশা বদলায়া দেব যদি এই লোকেরে কিছু করস। চাচা মিয়া আপনে দৌড় দেন।' ততক্ষণে কবিরের হাতে উঠে এসেছে কালো পিস্তলটা। তাক করে বাদলের দিকে। লোকটা সত্যি সত্যি দৌড় দেয়। খোড়া পা টানতে টানতে অদ্ভুত দ্রুততায় সে অন্ধকার গলিটা পেরিয়ে যায়। আমাদের নাগালের বাইরে চলে যেতে থাকে। আমার মাথায় রক্ত উঠে। আমি বাদলকে তাড়া দেই, 'এই দাড়ায়া আছস কেন? বুইড়ারে ধর।' বাদল দৌড় দেয়। আমি অবাক হয়ে দেখি ট্রিগারে কবিরের আঙুলটা তিরতির করে কাঁপছে। যে কোন মুহূর্তে টান পড়বে। সিদ্ধান্ত নিতে আমার দেরি হয়না কখনো। নীতিবাগিস বন্ধুর চেয়ে কুকুরের মত বিশ্বস্ত বাদল অনেক ভালো। প্রথম গুলি ডান কানের ফুটো দিয়ে ঢুকেছে। দ্বিতীয়টা পেট- বুকের মাঝামাঝি জায়গায়। টার্গেট দেখে আমি নিজেই অবাক হই। আমার হাত এতো ভালো? অথচ কবির কতদিন আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করেছে! দেখ কবির আমি তোর চেয়ে ভালো টার্গেট করতে পারি এখন! গুলির শব্দে ফিরে আসে বাদল। অবাক হয়ে একবার কবিরের তড়পানি দেখে। আরেকবার দেখে আমাকে। আমি মোটর সাইকেলে উঠে বাদলকে বলি, 'চল বুইড়ারে খুইজা বাইর করি। এক লাখ টেকা আজকে লাগবই লাগবো। না হইলে জানে মাইরা ফেলবে মুস্তাফিজ।'

কবিরের প্রিয় পিস্তলটা কুড়িয়ে নেয় বাদল, 'এইটা আমার কাছে থাকুক সাব্বির ভাই?' সায় দিতেই চকচক করে উঠে তার মুখ। মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিয়ে কবিরের দিকে আবার তাকায় সাব্বির। নড়াচড়া একেবারেই নেই। বীর মুক্তিযুদ্ধা নিজাম উদ্দিনের একমাত্র ছেলে ছাত্রনেতা কবির উদ্দিনের লাশটা কানাগলির শেষপ্রান্তের মাঠে পড়ে থাকে। অন্ধকারে।

ব্লগনাম / নজমুল আলবাব
এখন আছেন / সিলেট, বাংলাদেশ
যোগাযোগ / shomoyeropu@gmail.com

দ্বিধা

অভ্র পথিক

'কেমন লাগছে নতুন হোস্টেলে? রুম পছন্দ হয়েছে?'
'খারাপ না, এই চলে আর কি!'
'আর রুমমেট?'
'হ্যাঁ, মেয়েটাকে খুব ভালো লেগেছে। একদম শান্ত শিষ্ট। যা বলি সবই মেনে নেয়, কোনো কিছুতে 'না' নেই।'
'বাহ! তুমি তো তাহলে একটা 'জ্বি হুজুর' টাইপের রুমমেট পেয়েছো বলা যায়।'
'হুম, কিন্তু শুনেছি ওর স্বভাব ভালো না। অন্যদের কাছে শুনেছি, ও নাকি প্রতিদিন 'টুয়েন্টি এইট' খায়। ওর বয়ফ্রেন্ড সৌর থাকে চট্টগ্রামে, আর ও এখানে অন্য ছেলেদের সাথে প্রায়ই ডেটিং-এ যায়।'
'মানুষের সব কথায় কান দিতে নেই। এমনও তো হতে পারে মেয়েটা শান্ত বলে অন্যদের সহ্য হয় না, তাই তার নামে বাজে কথা বলে।'
'আরে না, আমি তো এসেছি চার-পাঁচদিন হলো। আমিও দেখেছি, ও বিকেল হলেই সাজগোজ করে বের হয়ে যায়, ফেরে আটটার দিকে আর প্রায় হাতে থাকে নতুন একটা মোবাইল। জিজ্ঞেস করলে বলে, ওর ফ্রেন্ডের বা বড় ভাইয়ের। আচ্ছা, সবাই কি নিজের মোবাইল এভাবে এক্সচেঞ্জ করে?'
'কি জানি! তারপরও এরকম অনুমান থেকে হুট করে কিছু বলাটা ঠিক না।'
'আরো একটা ব্যাপার। প্রতিদিন রাতে সে ঘন্টার পরে ঘন্টা কথা বলে হয় ফ্রেন্ড বা বড় ভাইয়ের সাথে। কথা বলার ভঙ্গি দেখে মনে হয় যেন বয়ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলছে।'
'হুম, বুঝলাম।'
'এই, একটু ধরো তো, কে যেন দরজায় নক করছে। (কে...?)। এই, স্বপ্না এসেছে। এখন রাখি, একটু পরে মিসকল দিচ্ছি।'

সজীব চৌধুরী জয় নতুন চাকরীতে জয়েন করেছে। চট্টগ্রামে পোস্টিং। নতুন কোম্পানিটা তার কাছে বেশ ভালো লাগছে। সব কলিগরাই বেশ আন্তরিক, বিশেষ করে সৌরভ নামে ছেলেটা। এই কয়দিনেই জয়কে কেমন যেন বন্ধুর মতো আপন করে নিয়েছে। দুপুরের লাঞ্চ ওরা এক সাথেই করে। সৌরভের প্রায় সবকিছুই সে জয়ের সাথে শেয়ার করে কিন্তু জয় সেটা পারে না। বাস্তব জীবনে সে কিছুটা অর্ন্তমুখী স্বভাবের। এরকমই এক দুপুরে জয় আর সৌরভ অফিস ক্যান্টিনে বসে লাঞ্চ করছে, এমন সময় সৌরভের ফোন আসে। সৌরভ বলে, 'সরি সজীব ভাই, আমার গার্লফ্রেন্ড স্বপ্নার ফোন।' জয় মৃদু হেসে বলে, 'নো প্রবলেম, ক্যারি অন।' স্বপ্না নামটা খুব পরিচিত মনে হয় জয়ের। ফোন রিসিভ করেই সৌরভ বলে, 'কি ব্যাপার আজ সকাল থেকেই ম্যাডামের কোন খবর নেই। আমি তো ভাবলাম কি হলো, অন্য কেউ প্রক্সি দিচ্ছে নাকি?'
'আর বলো না, আমার আগের রুমমেট আজ সকালে চলে গেছে। অন্য আরেকজন এসেছে। ওর জিনিসপত্র টানা-হ্যাচড়া করে সেট করতে করতে টায়ার্ড হয়ে গেলাম।'
'ওহো! ভুলেই গিয়েছিলাম! কি যেন নাম ছিলো মেয়েটার? ও হ্যাঁ, ফাগুন, ফাগুন অডিওভিশন (ফাগুন নামটা শুনেই জয় আরো মনোযোগী হয় ওদের কথোপকথনে)। হা হা হা। মেয়েটা খুব ভালো ছিলো। দেখো নতুন যে এসেছে সে কেমন হয়!
'হুম, ভালো ছিলো, তবে স্বভাব খুব একটা ভালো ছিলো না।'
'মানে?'
'ও প্রতিদিন 'টুয়েন্টি এইট' খেতো। ওর বয়ফ্রেন্ড 'জয়' থাকে সিলেটে আর ও এখানে অন্য ছেলেদের সাথে...'

সৌরভ ফোন রাখতেই জয় প্রশ্ন করে, 'স্বপ্না কোথায় থাকে? হোস্টেলে?' সৌরভ বলে, 'হ্যাঁ, ওইতো, ফার্মগেটের ওখানে মেয়েদের একটা হোস্টেল আছে না, শান্তিনীড় না শান্তনীড় এরকম নামে, ওটাতে।' জয় কিছুক্ষণের জন্য বিস্ময় বিহ্বল হয়ে বসে থাকে। তার স্বপ্নের রঙিন পৃথিবীর কাঁচগুলো সশব্দে এক এক করে ভাঙতে শুরু করে। সে বুঝতে পারে না, কার কথা সে বিশ্বাস করবে? ফাগুনের নাকি স্বপ্নার?

ব্লগনাম / ঝরাপাতা
এখন আছেন / সিলেট, বাংলাদেশ
যোগাযোগ / avrobth@gmail.com

দৈনন্দিন

আনোয়ার সাদাত শিমুল

গুজব হিসেবে কথাটা আগেও কানে এসেছিলো, কিন্তু আজ সকালে পাশের বাসার নঈম চাচা হাতেনাতে ধরার পর আমরা ব্যাপারটি নিয়ে ভাবি। মেজো ভাইয়া বলছে, 'এক মুহূর্তও দেরি করার দরকার নেই, এক্ষুণি বিদায় করে দাও।' বড় ভাইয়া কিছুটা নমনীয় হয়ে বললেন, 'বেশি হৈ-হল্লা করো না, কিছু ধমক দিয়ে শাসিয়ে দাও।' আমিও বুঝতে পারি, এরকম করিৎকর্মা লোক পাওয়া সহজ না। তবুও - গত দু'মাস ধরে শুনছিলাম আমাদের বাসার দারোয়ান মাসুদের ঘরে মেয়েছেলে আসে মাঝরাতে এবং খুব ভোরে চলে যায়। নঈম চাচার চিল্লাচিল্লিতে আজ পাশের তিন বাসার লোক জড়ো হয়েছে। বড় ভাবী লজ্জায় রুম থেকে বেরই হচ্ছেন না। ভদ্র এলাকার ভদ্র বাড়ির সম্মান আর থাকলো না! আমি সরাসরি বলে এলাম, 'সন্ধ্যায় এসে যেন মাসুদের চেহারা না দেখি, দরকার হলে আমি রাতে বাসা পাহারা দেবো।'

রুবার আঙুলগুলো ছুঁয়ে আমি ক্রমশ শিশু হয়ে উঠি। তার হাত দুটো নিয়ে আমার চোখে-মুখে, ঘ্রাণ নিই। এরকম প্রায়ই হয়, সপ্তায় একবার কিংবা মাসে পাঁচবার অথবা তারও বেশি। আজ রুবা চুপচাপ, বলছিল, ওর বাবার হেমোডায়ালাইসিসের মাত্রা বাড়বে আগামী মাস থেকে, বাড়বে খরচও। তখন আমার নাক রুবার চিবুক পেরিয়ে গলায়, খানিক নিচে। অফিসে প্রতিদিন নয়টা-পাঁচটা কাঁচের ওপাশের রুবা, সিল্কের শাড়ির স্বচ্ছতায় ফরসা পেট, মৃদু পারফিউম - সব আমার হাতের নাগালে এলে আমি শিশু থেকে দানব হয়ে উঠি। ব্যাচেলর অনুপের নিরাপদ বাসা-বিছানা-বাতি ক্রমশঃ আপন হয়ে আসা পরিবেশে আমি দূরন্ত পারঙ্গম কৌশলী পুরুষ। রুবার হয়তো দমবন্ধ লাগে, তাই চোখ বুঁজে থাকে। এভাবেই অল্প সময়টুকু শেষ হয় দ্রুত। ...আরও পরে মাথা নিঁচু করে রুবা বলে, 'এবারও এক হাজার?' আমি বিরক্তি নিয়ে মানিব্যাগ থেকে একশ' টাকার একটি মলিন নোট তুলে দিই রুবার হাতে।

মাসুদকে তাড়ানো হয়নি। শেষে নঈম চাচার সুপারিশেই ক্ষমা করা হয়েছে। বড় ভাইয়া, মেজো ভাইয়াও মাফ করে দিয়েছেন। রাতে মাসুদ আমার পা ধরে মাফ চাইলে আমার মেজাজ চরমে উঠে যায়, কষে চড় মেরে বলি, 'আর যদি একবার এসব শুনি... ব্যাটা হারামজাদা, বদমায়েশ!'

ব্লগনাম / আনোয়ার সাদাত শিমুল
এখন আছেন / পাতায়া, থাইল্যান্ড
যোগাযোগ / shimul.bph@gmail.com

প্রাগৈতিহাসিক

জ্যোতির্ময় বনিক

'বাচ্চারা, তোমরা মনোযোগ দিয়ে প্রাণী গুলোকে দেখ। কাছে গিয়ে দেখতে পারো, তবে কেউ কিছু ছুঁড়বে না খাঁচার ভেতর। আর প্রাণী গুলোকে নিয়ে তোমাদের যদি কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে প্রতিটি খাঁচার পাশে যে লাল বোতামটা আছে সেটায় চাপ দেবে। হলোগ্রাফিক গাইড ইমেজ এসে সেই প্রাণীর সব তথ্য তোমাদের জানিয়ে দেবে।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে হাপাতে লাগলেন রু-দের স্কুলের জীববিজ্ঞান শিক্ষক।

আজ রু-দের নিয়মিত ক্লাস নেই। ওদের নিয়ে আসা হয়েছে এই মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় মহাজাগতিক চিড়িয়াখানায়, যেখানে প্রায় সকল মহাজাগতিক প্রাণীই রাখা আছে। রু এর অধিকাংশ বন্ধুই অবশ্য চিড়িয়াখানা ঘুরে দেখার নাম করে চোখের আড়ালে গিয়ে কোথাও বসে গল্প করবে। রু এর গল্প করতে দারুন লাগে, কিন্তু পশু-পাখি দেখতেও ওর চমৎকার লাগে। তাই ও ঠিক করেছে, ঘুরে ঘুরে পুরো চিড়িয়াখানাটাই দেখবে। রু এর সবচেয়ে ভালো বন্ধু হচ্ছে রিকু। ওকে পুরোটা ঘুরে দেখার কথা বলতেই, চোখ কুঁচকে মুখে একটা বিরক্তির ভাব এনে এমন ভাবে হাতটা উল্টালো, যেন ঘুরে দেখার কথা বলে রু একটা খুবই জঘন্য কিছু বলে ফেলেছে। রু আর কাউকে না বলে নিজেই ঘুরতে শুরু করে দিল।

কত যে অদ্ভুত প্রাণীই আছে এই মহাবিশ্বে! লাল রঙের সেই সাপের মত প্রাণী যেটা গত শতাব্দীর শেষ দিকে পাশের গ্যালাক্সির একটা গ্রহে পাওয়া গিয়েছে, সেটা দেখে রু রীতিমত মুগ্ধ! আর যখন সে প্রাণীটাকে দেখলো, যে নিজের শরীর থেকে তাড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ বের করে, সে পুরো অবাক হয়ে গেল। ঘুরতে ঘুরতে কখন যে সে পেছন দিকটাতে চলে এসেছে নিজেও খেয়াল করেনি। হঠাৎ একটা খাঁচার সামনে এসে রু এর চোখ আটকে গেল। কালো, কিছুটা ছোটখাটো একটা প্রাণী রাখা এই খাঁচাতে। চিড়িয়াখানার সব খাচাতেই প্রাণী গুলোর বৈজ্ঞানিক নাম লেখা। এটাতে লেখা *bangus exsapiens*। রু এর কেন যেন মনে হলো, প্রাণীটা অদ্ভুত একটা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। অনেকটা মানুষ যেভাবে তাকিয়ে থাকে সেরকমই দৃষ্টিটা। আগ্রহী হয়ে রু খাঁচার পাশের বোতামটা চাপ দিতেই গাইডের হলোগ্রাফিক ইমেজ এসে বলা শুরু করলো, '...*bangus exsapiens* প্রাণীটার বিশেষত্ব এই যে, এটিই একমাত্র প্রাণী যেটি এক সময় মানুষ ছিলো। অনেক শতাব্দী আগে, যখনও মানুষ সৌরজগতের বাইরে প্রাণের সন্ধান পায়নি, তখন *bangus exsapiens* সম্পূর্ন মানুষ ছিলো। তারা যে ভূখন্ডে থাকতো তাকে বলা হত 'বাংলাদেশ'। ভূখন্ডটির ভৌগলিক অবস্থান চমৎকার হলেও সেখানে প্রতিদিনই দূষণের মাত্রা ভয়াবহ ভাবে বাড়ছিলো। সে ভূখন্ডের রাজধানীতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে সীসা ছিল। তা ছাড়া খাদ্য হিসেবে অনেক বিষাক্ত জিনিস যেমন ফরমালিন, কার্বাইড এসব খাওয়ার ফলে তাদের ফুসফুসের অবস্থাও খুব খারাপ ছিল। এক সময় দেখা গেল শিশুরা জন্মাচ্ছেই অপরিণত ফুসফুস নিয়ে। এভাবে ধীরে ধীরে তাদের মিউটেশন হয় আর তারা হয়ে যায় খাটো, দুর্বল ফুসফুস এর এক প্রাণী। তারা ভুগতে থাকে খাদ্যাভাবে। এরপর শুরু হয় খাদ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি। এর পর তাদের শুরু করতে হয় খাদ্য শিকার। এভাবেই দু'পা থেকে আবার চার পায়ে ভর দিয়ে হাটতে শুরু করে তারা। এ প্রজাতির খুব কম প্রাণীই এখন জীবিত পাওয়া যায়। যাদের পাওয়া যায় তারা এখনো আংশিকভাবে মানুষের সাথে যোগাযোগে সক্ষম বলে ধারণা করা যায়।

শুনতে শুনতে একদম তন্ময় হয়ে গিয়েছিলো রু। একদমই খেয়াল করে নি, গাইড ইমেজের কথা শুনতে শুনতে এই বিশ্রী কদাকার প্রাণীটার চোখ বেয়ে কখন যেন দু' ফোটা জল গড়িয়ে পড়েছে...

ব্লগনাম / সবজান্তা
এখন আছেন / ঢাকা, বাংলাদেশ
যোগাযোগ / know_banik@yahoo.com

অবশেষে অরিন্দম...

অমিত আহমেদ

'নয়া বুঝি?' নির্লিপ্ত মুখে কফির মগে চুমুক দিতে দিতে জিজ্ঞেস করেন ভদ্রলোক। কফি হাউসের অন্য সব টেবিল দখল হয়ে গেছে দেখে বাধ্য হয়েই মগ ভর্তি গরম কোকা নিয়ে উনার টেবিলে এসে বসেছি। ভদ্রলোকের দৃষ্টি লক্ষ্য করে কাঁচের দেয়াল টপকে বাইরে তাকাতেই একটা প্রসন্ন হাসি ফুটে ওঠে ঠোঁটে। গর্ব নিয়ে বলি, 'এ-ক্কে-বা-রে! মাজদা সিএক্স নাইন। দু'হাজার পাউন্ডের দৈত্য একটা! ৩.৫ লিটার ভিএইট ইঞ্জিন। ২৬৩ হর্সপাওয়ার। ২৪৯ পাউন্ড-ফিট টর্ক। টিল্ট-টেলিস্কোপিক স্টিয়ারিং হুইল। ১৮ ইঞ্চি অ্যালয়।'

'হুম...' বেজার মুখে কফির কাপে চুমুক দেন তিনি। বলেন, 'অন্য ভাবেও দেখা যায়। এক ট্যাঙ্ক তেলে চলবে ৩২৪ মাইল। সে থেকে গ্রীন হাউস গ্যাস তৈরি হবে ১১ টনের মতো! আপনাদের 'অবদানের' জন্য সামনের বছরটা হবে এই বছরের চেয়ে উষ্ণ। মেরুর বরফ গলবে আরও কয়েক ইঞ্চি। আরও ভয়াবহ হবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। দেখা দেবে জটিল সব রোগ। মা জন্ম দেবে অসুস্থ বাচ্চার। বিলীন হবে উপকূলীয় শহর আর দেশ গুলো। আমাদের সভ্যতা হবে হুমকির সম্মুখিন।'

'ও!' মুখটা কালো হয়ে যায় আমার। সর্ব মনোযোগ কোকার কাপে ঢেলে দিয়ে মুখ লুকোবার চেষ্টা করি।

'হিসেবটা পছন্দ হলো না তো? আচ্ছা অন্য হিসেব করি তাহলে। ৩৪০০০ ডলার দিয়ে কিনেছেন। তার উপর তেল, ইনশ্যুরেন্স এটা সেটা মিলে বাৎসরিক খরচ পড়বে ৭৫০০ ডলার। ইউএন বলে শুধু উন্নয়নশীল দেশেই ৮২ কোটি ক্ষুধার্ত মানুষ আছে। এর মধ্যে প্রতি বছর না খেতে পেয়ে মারা যায় আড়াই কোটি মানুষ, যার একটা বড় অংশ শিশু। আফ্রিকার কথা বলি। সেখানে মাসিক ২০ ডলারে একটা শিশুকে দত্তক নেয়া যায়, ৮০ ডলারে একটা স্কুল চালানো যায়, ১২০ ডলারে পুরো একটা গ্রাম। বুঝলেন?'

'জ্বী!' মুখটা শুকিয়ে যায় আমার। একটু আগে গর্বে মাটিতে পা-ই পড়ছিলো না। এবার লজ্জায় সেই মাটিতেই সেঁধিয়ে যেতে মন চাইলো।

'যে টাকা আছে আমার এমন তিনটে গাড়ি অনায়াসেই গ্যারাজে ফেলে রাখতে পারি। কিন্তু নিজে চালাই সাইকেল। প্রতিদিন বিকেলে হাসপাতালে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করি। আফ্রিকায় দত্তক নেয়া বেশ কয়েকটা শিশু আছে আমার। ছবি দেখবেন?' মানিব্যাগের জন্য পকেটে হাত চালান ভদ্রলোক, কিন্তু থেমে যান বাঁধা পেয়ে। পেছন থেকে কাঁধে হাত রেখেছেন ইউনিফর্ম পড়া এক অফিসার, 'কি মাইক? মদ ছেড়ে কফি ধরেছো তাহলে? বেশ বেশ!'

পুলিশের উপস্থিতিতে খুব যে খুশি হলেন না তা স্পষ্ট বোঝা গেল। চট করে উঠে দাঁড়ালেন। আমাকে বললেন, 'ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে। কথা গুলো মনে রাখবেন।' এরপর অফিসারের দিকে ফিরে সম্মান দেখিয়ে একটু মাথা নুইয়ে ধাঁ করে বেরিয়ে গেলেন কফিহাউস থেকে। কাঁচের দেয়াল ভেদ করে দেখলাম দেঁয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো একটা সাইকেলে উঠে বসলেন।

'চমৎকার ভদ্রলোক!' অফিসারের সাথে কথা চালাবার উদ্দেশ্যে বললাম আমি।

'তাই? এক মাস আগেও কিন্তু এ কথাটা বলতেন না আপনি!'

'কেন, তা কেন?'

'পাঁড় মাতাল ছিলো। সারাক্ষণ পকেটে হুইস্কির বোতল। তাই শুধু না, মাতাল হয়ে জনাবের শখ হতো ফর্মুলা ওয়ান রেসার হবার। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়তো রাস্তায়। ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিলো আমাদের। গতমাসে গভীর রাত্রে মাতলামি করে গাড়ি নিয়ে সটান ঢুকে পড়লো একটা রেস্তোরায়। টনক নড়লো কোর্টের। রায় দিলো - সারাজীবনের জন্য লাইসেন্স বাতিল, আঠারো হাজার ডলার ক্ষতিপূরণ, ছয় মাস মুফত জনসেবামূলক কাজ আর বাধ্যতামূলক মদ্যত্যাগ কাউন্সেলিং...' চেয়ারটা টেনে একেবারে আমার সামনে বসে পড়লেন অফিসার, 'বাকি সব ঠিক আছে। কিন্তু এই লাইসেন্স বাতিল করাটা একেবারে মানসিক ভাবে ধ্বংস করে দিলো লোকটাকে। গাড়ি... বুঝলেন? ছিলো মাইকের জান!'

ব্লগনাম / অমিত আহমেদ
এখন আছেন / টরান্টো, কানাডা
যোগাযোগ / aumit.ahmed@gmail.com

বাথটাবে একা

জাহিদ হোসেন

ফোঁটাগুলো টপ টপ করে পড়ছে। আগে তাড়াতাড়ি পড়ছিলো, এখন অতো দ্রুত নয় গতি। একবার বাথরুমে ঢুকলে আর বেরোই না, এই রকম একটা বদনাম আছে আমার নামে। আমার কি দোষ? এত সুন্দর বাথটাব যে একবার পানির মধ্যে শরীর ডুবিয়ে দিলে আর উঠতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় - অনন্তকাল যদি এইভাবে শুয়ে থাকতে পারতাম। কী আরাম, কী প্রশান্তি! কিন্তু বেশীক্ষণ কি আর শুয়ে থাকা যায়? কেউ না কেউ এসে দরজায় ধাক্কাধাক্কি শুরু করবেই, 'বেরো-তাড়াতাড়ি বেরো। আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।' তখন বাধ্য হয়েই সাড়া দিতে হয়, 'আসছি, আমি আসছি।'

আজ অবশ্য সে ভয় নেই। আজকে বাড়ীর সবাই গেছে এয়ারপোর্টে। পড়াশুনার অজুহাতে আমি শুধু রয়ে গেছি একা। আজকে আমাকে কেউ ডাকবে না। বাথটাবে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে যখন শুয়ে থাকি তখন প্রতিবারই আমার মিঠুর কথা মনে পড়ে। মিঠু সব সময়ে বলে, 'রত্না-আমাদের বাসাতেও একটা বাথটাব থাকতে হবে। তোর যখন এতই পছন্দ।' আমার হাসি পায়। বেকার মিঠুর এই পৃথিবী সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। সে শুধু বেকারই না, সে একটা ইডিয়েট। মিঠু মনে করে - তাকে আমি বিয়ে করবো। বেকার মিঠুর সাথে বিয়ে হবে শহরের সবচেয়ে ধনীর মেয়ে রত্নার। প্রশ্নই ওঠে না।

'তাহলে তুই আমার সাথে রোজ কথা বলিস কেনো? আমাকে নিশ্চয়ই তোর ভালো লাগে।'

'মিঠু-তুই একটা গাধা। আমি তো রোজ আমাদের ড্রাইভারের সাথেও কথা বলি। তাতে কি?'

মিঠু হা হা করে হাসে, 'রত্না বেগম - তুই এখনো ভাল করে মিথ্যে কথাটাও বলতে শিখলি না।'

বাবার বন্ধুর ছেলে মাহতাব বিদেশ থেকে ফিরছে আজ। তাকেই রিসিভ করতে বাড়ির সব লোক গেছে এয়ারপোর্টে। আমারও যাওয়ার কথা ছিল। দু'সপ্তাহ পরে মাহতাবের সাথেই আমার বিয়ে হতে যাচ্ছে। কয়েকদিন আগে আমার সাথে কথা হয়েছিল তার, 'তুমি এয়ারপোর্টে থাকবে তো? তোমাকে না দেখলে আমার খুব মন খারাপ হবে।' মাহতাবের গলার স্বর কী আশ্চর্য রকমের নরম। শুনলে চোখে পানি আসে। আর মিঠুর গলার আওয়াজ হচ্ছে বিচ্ছিরি। একবার শুনলে রাগে গা জ্বলতে থাকে।

মিঠুকে বলেছিলাম - মাহতাব আসছে, বলেছিলাম - তার গলার স্বরটি নরম এবং দয়ালু। এই প্রথমবারের মতো মিঠু হা হা করে হাসেনি। হেসেছিলো, তবে সেটি কেমন ম্লান একটা হাসি। ইডিয়েটরা যেমন করে করে হাসে। মিঠু যে কতো বড় একটা ইডিয়েট তা আজ সকালে টের পেয়েছি। শহরের একদম শেষ মাথায় রেল লাইনে ঝাঁপ দিয়েছে একজন মানুষ। ড্রাইভার বেলাল যখন ঘটনাটি বাবাকে বলছিলো, তখনই আমি আন্দাজ করেছিলাম যে এটা ঐ ইডিয়েটই হবে। তারপর ফোন করলাম ওর মোবাইলে। সেখানে শুধু একটি মেসেজই বাজছে, 'ভাল থেকো।'

এ রকম বোকামীর কোনো মানে হয়? সে কি ভেবেছিল যে আমি তার জন্যে আমার সারা জীবন নষ্ট করবো? কেউ কোনদিন করে? আমাকে অপরাধবোধে ভোগানোর চেষ্টা? আমার কিসের দোষ? আমি তো কোনদিন তাকে বলিনি - আমি তাকে ভালোবাসি। যদিও মিঠুর মতে একমাত্র মুখেই নাকি আমি বলিনি, আর তাছাড়া আমার চোখে, কথায়, হাসিতে, রাগে, হাত নাড়ানোয়, সবখানেই নাকি স্পষ্ট আমার ভালোবাসা। এটা একটা কথা হলো? যাকগে - আমার কোনো অপরাধবোধ নেই, চোখে জল নেই। আমি এখন বাথটাবে শুয়ে থাকবো অনেকক্ষণ। মিঠুর কথা ভুলেও মনে করবো না।

কেউ কি ডাকছে আমাকে? নাহ, কে ডাকবে? সবাই তো এয়ারপোর্টে। এখন ফোঁটা পড়া প্রায় থেমে এসেছে। বাব্বাহ - আমার মতোন এতটুকু পুঁচকে একটা মেয়ের গায়ে এতো রক্ত থাকে জানতাম না তো! সেই কখন থেকে হাতের শিরা কেটে বসে আছি বাথটাবে। কেউ আমাকে ডাকছে না। তবুও সাড়া দিলাম, 'আসছি মিঠু, আসছি। এত অস্থির হলে হয়!'

ব্লগনাম / জাহিদ হোসেন
এখন আছেন / ওয়াশিংটন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
যোগাযোগ / প্রকাশক মারফত

আফসোস

লুৎফুল আরেফীন

'নাও, হয়ে গেল!'
'জ্বী প্রভু!'
'এই যন্ত্রটি তোমার কাজকে অনেক সহজ করে দেবে।'
'জ্বী প্রভু!'
'পৃথিবীতে উচ্চারিত বা অবস্থিত প্রতিটি শব্দের তীব্রতা বা উচ্চারিত হবার সংখ্যা, স্থান-কাল-পাত্র, তাৎপর্য - সবই জানা যাবে এই যন্ত্র থেকে।'
'অসাধারণ আপনার সৃষ্টি প্রভু।'
'যাও তোমার কাজ শুরু করো।'

স্রষ্টার কাছ থেকে নতুন তৈরি যন্ত্রটির পরিচয় আর ব্যবহার প্রণালী শিখে নিয়ে নিজের কার্যালয়ে চলে আসলো ফেরেস্তা মালাখ। এখন কাজ হচ্ছে, পরবর্তী কয়েক বছর যন্ত্রটি নিয়ে গবেষণা আর তার ফলাফল স্রষ্টাকে জানানো। মালাখের মূল দায়িত্ব হবে পৃথিবীতে উচ্চারিত শব্দগুলোর ভেতরে ভারসাম্য খোঁজা। সেটা থেকে পৃথিবীর অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

প্রথম কয়েকদিন ধরে মালাখ প্রচুর উৎসাহ নিয়ে শব্দগুলোর সঙ্গে পরিচিত হলো। কতোগুলো পছন্দের শব্দ কন্ট্রোল প্যানেলের টাইপিং প্যাডের মাধ্যমে ইনপুট করলেই মনিটরে দেখানো হয় শব্দগুলোর উচ্চারণ সংখ্যা বা তীব্রতা, কোন কোন অঞ্চল থেকে সেটি সর্বোচ্চ উচ্চারিত হচ্ছে তার পরিসংখ্যান, আরও অনেক তথ্য। যে শব্দের তীব্রতা যতো বেশি তার রং ততো লাল। এ কয়দিনে মালাখ যে শব্দগুলো নিয়ে খেলেছে সেগুলো হলো 'ভালোবাসা', 'হত্যা', 'ক্ষুধা' আর 'আফসোস'। সবগুলো শব্দেরই তীব্রতা অত্যাধিক। প্রত্যেকেটা থেকে তীব্র লাল একটা আলো সারাক্ষণ জ্বলে আছে। তবে সেটা সমস্যা নয় মালাখের জন্য। তার সমস্যা আলো জ্বলে থাকলে থাকুক কিন্তু ঔজ্জ্বল্যের কোনও তারতম্য নেই কেন? আলোগুলো কি একটুও কাঁপবে না? হেরফের হবে না? সারাক্ষণ এরকম করে জ্বলে থাকলে সে কী ধরে নেবে? মালাখ বুঝে উঠতে পারে না।

'অনুঘটকগুলো পরিবর্তন করে দেখো।'
'জ্বী মহামান্য আমি তাই করবো।'

স্রষ্টার পরামর্শক্রমে মালাখ এবার নানারকম প্যারামিটার নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করে। যেমন পৃথিবীর লোকসংখ্যা বদলে দেয়া, নদ-নদী শুকিয়ে দেয়া, এমনকি আবহাওয়া পরিবর্তন করে দেয়া। অনেক কিছুই করা সম্ভব এই যন্ত্রের মাধ্যমে। নিজের অফিসে বসে মালাখ এবার যন্ত্রের ইনপুট প্যানেলে একটা একটা করে প্যারামিটার বদলাতে লাগলো। পৃথিবীর সকল নারীকে সরিয়ে ফেললে কী হয়? উত্তরটা সাথে সাথেই জেনে গেল মালাখ। সবগুলো শব্দই খানিকটা ম্লান হয়ে গেল। মালাখ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। যন্ত্রটা আসলেই অসাধারণ! হঠাৎ কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে চোখ পড়ে তার। নাহ! সবগুলো ম্লান হয়নি।'আফসোস' শব্দটা একই রকম জ্বলছে! আরোও কিছুক্ষণ প্যারামিটারগুলো পরীক্ষা করলো সে। নাহ ভুল তো নেই। মালাখের উত্তেজনা বেড়ে গেলো। যন্ত্রটা সম্পর্কে তার কৌতূহলও। আরো কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। আবহাওয়া, জনসংখ্যা, প্রানের অস্তিত্ব, স্থলভাগ-জলভাগের তারতম্য, গ্রহ-উপগ্রহের সংখ্যা এমনকি সূর্যের সংখ্যা সব বদলাতে লাগলো মালাখ এক এক করে। সাথে বদলে যেতে লাগলো প্যানেলের শব্দগুলোর উজ্জ্বল্যও। কিন্তু 'আফসোস' এর বিন্দুমাত্র তারতম্য দেখার সুযোগ একবারের জন্যও হলো না মালাখের। নিজে সহ সমস্ত ফেরেস্তাকুলকেও একবার উধাও করে দিলো সে। লাভ হলো না।

'এটা নিঃসন্দেহে একটা 'বাগ' হুজুর! সবকিছু পরীক্ষা করেই বলছি!'
'তাই নাকি?'
'জ্বী মহামান্য। মানুষের সংখ্যা শূন্য করেছি। সমস্ত পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীকে নিঃশেষ করেছি। চার চারটে সূর্য্য দিয়ে জ্বালিয়ে তামা করে দিয়েছি পৃথিবীর জল-স্থল আর বায়ুমন্ডল। কিছুতেই কিছু হয় না। 'আফসোস' মরে না।'
'তোমার অজ্ঞতা আমাকে অবাক করলো, ফেরেস্তা!' (মালাখ মাথা নীচু করে থাকে) 'আমাকে কখনোও 'নেই' ধরেছো?'

ব্লগনাম / লুৎফুল আরেফীন
এখন আছেন / ভুইর্‌ৎস্‌বুর্গ, জার্মানি
যোগাযোগ / l_arefin@yahoo.com

কয়েকটি অণুগল্পের প্রচেষ্টা

সুমন চৌধুরী

হ

কোনো এক ঠাঠা গ্রীষ্মের দুপুরে ঘাম চুপচুপে গেঞ্জি কাঁধে নিয়ে চারতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাঁসফাঁস করছিলাম, হঠাৎ কোথা থেকে শিস্ দিতে দিতে প্রিন্সের আগমন। মুখে মৃদু হাসি।

'একটা গল্প শুনবি?'

'হ।'

'একটা লোক ছিল। তার কান্ধে একটা গেঞ্জি। আমি তারে জিগাইলাম একটা গল্প শুনবেন? সে কয়, হ।'

তোষক

কোনো এক তুষারাবৃত রাতে লী গাং এর কলিং বেল বেজে উঠল। দরজা খুলতেই নাতাশা এস্তানেভা, হাসি মুখে 'সারপ্রাইজ!' বলে ঢুকে পড়লো।

'আমার শেষ ট্রাম চলে গেছে। আজ রাতটা তোমার বাসায় থাকতে দেবে?'

লী গাং থতমত খেয়ে বললো, 'কিন্তু আমার ঘরে তো একস্ট্রা ম্যাট্রেস নেই!'

নষ্ট

বালক স্কুলে যায়। মাঠে খেলে। বাড়িতে খায়, ঘুমায়। যা-ই কানে আসে সারাদিন সব স্মৃতিতে টুকে রাখে। সেরকম একদিন স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করার সময় বালকের বাপ ধরে ফেললো।

'এগুলা বলবি না।'

'কেন?'

'এগুলি খারাপ কথা।'

'খারাপ কথা বললে কি হয়?'

'মানুষ খারাপ বলে?'

'কেন খারাপ বলে?'

'কারণ এগুলা বললে পোলাপান নষ্ট হইয়া যায়?'

'নষ্ট কিভাবে হয়? আমাদের রেডিও- টিভির মতো?'

'হ্যা।'

'আচ্ছা।'

বাটোয়ারা

দুই বন্ধু। হলে থাকে। একজন বামপন্থী রাজনীতি করে আর একজন 'বুর্জোয়া' রাজনীতি করে। 'বুর্জোয়া'র বাড়ি পাবনা। একদিন তারা দু'জন, আরো দু'জন ছাত্রের সাথে হলে বসে ব্রে খেলছিল। বামপন্থীর বাটা। বাটায় ভুল হলো। পাবনাই 'বুর্জোয়া' চৌদ্দ নম্বর কার্ড নেড়ে ধমকে উঠলো, 'ভেড়াচ্চোদা, তেরোটা কইরে কার্ড বাইটে দিতে পারিস না আবার সোমাজতন্ত্রের কথা কইস!'

ব্লগনাম / সুমন চৌধুরী
এখন আছেন / কাসেল, জার্মানি
যোগাযোগ / absage2001@googlemail.com

বন্ধু

নিঘাত তিথি

সূর্য ডুবে যাবার অল্প কিছু সময় পর থেকে বারান্দায় এসে বসে আছেন জামাল সাহেব।

বয়স বাড়ছে আর প্রতিটা দিনের দৈর্ঘ্য বুঝি বেড়ে যাচ্ছে সমানুপাতিক হারে। অবসর নেবার পর এই সাড়ে তিন বছরে ধীরে ধীরে শরীরটায় কেমন বুড়ো বুড়ো একটা গন্ধ টের পান তিনি। স্ত্রী মনোয়ারা বেগম গত হয়েছেন প্রায় পাঁচ বছর। এখন হাতে থাকা অফুরন্ত সময়ের অধিকাংশই কাটে অলস ভাবনা আর বিগত দিনের দেনা-পাওনার হিসেব কষে। আর সময়ের সাথে সাথে সবার থেকে একটু একটু করে আলাদা হয়ে যেতে থাকেন তিনি।

জামাল সাহেবের তিন ছেলেমেয়ে। বড় ছেলে আর মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে, ছোটটি কলেজে। তিন ছেলেমেয়ে আর জামাল সাহেব ছাড়া এই বাড়িতে শেষ সদস্যটির নাম বাদশা - তাদের বাসার কাজের ছেলে। এক বছর আগে তিনি বাদশাকে পেয়েছিলেন কাঁচা বাজার করার সময়। সাত/আট বছরের ছেলেটা রোজ তার বাজারের ব্যাগ টেনে দিতো। কাজ শেষে বখশিস পেয়ে তার মুখ ভরে উঠতো নির্মল হাসিতে। টুকটাক কথায় জানা গিয়েছিলো - তিনকূলে তার কেউ নেই, বাজারে ব্যাগ টানার এই কাজ করেই কোনো মতে চলে। জামাল সাহেবের বড় মায়া হয়। একদিন কি ভেবে একেবারে বাসায়ই নিয়ে এলেন তাকে।

লাল আভা কেটে গিয়ে অন্ধকার গাঢ় হতে শুরু করেছে। একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনোয়ারার কথা মনে পড়ে জামাল সাহেবের। সারাদিন অফিস শেষে এই বারান্দার মুখোমুখি দু'টি চেয়ারে বসে চা খেতে খেতে গল্প করার সুখময় সময়গুলো কি সত্যি কখনও ছিলো তার জীবনে? চোখ ভরে আসে জলে। খুব বেমানান আবহ সংগীতের মত বড় ছেলের ঘর থেকে ভেসে আসছে তুমুল হুল্লোড়, বন্ধুদের নিয়ে পার্টি হচ্ছে। মেয়েটা নিশ্চয়ই রোজকার মতো এই সময়টায় মোবাইল ফোনে ব্যস্ত। ছোট ছেলের সামনে পরীক্ষা, নিজের বাসায় তার পড়া হয় না বলে নাকি বন্ধুর বাড়িতে থেকে আজ সারারাত পড়বে। বারান্দার চেয়ারটায় একলা বসে থেকে জামাল সাহেবের বড় শূণ্য লাগে চারপাশটা।

ঠিক এই সময় সামনের গোল টেবিলটায় চা-ভর্তি একটা কাপ আর দু'টো টোস্ট নামিয়ে রেখে তার সামনে মেঝেতে বসে পড়ে বাদশা। এক মুহূর্ত যায়। আরো কিছু মুহূর্ত কাটে নীরব চাহনিতে। কোন কথা হয় না, তবু কী যেন বলা হয়ে যায় তাদের।

ব্লগনাম / নিঘাত তিথি
এখন আছেন / মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া
যোগাযোগ / প্রকাশক মারফত

মায়িশার আম্মার সাথে দায়িত্বশীল দুপুর

হাসান মোরশেদ

বেডরুমে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা মায়িশার আম্মার নিরাবরন শরীরে চোখ পড়ে আবার। রাখালগঞ্জের সরু রাস্তাটার কথা মনে পড়ে যায়। ঐ রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ উঁচু হয়ে উঠা একটা ছোট ব্রীজ ছিলো, যেমন মায়িশার আম্মার সরু কোমরের নীচ থেকে হঠাৎ জেগে উঠা আশ্চর্য উলটানো কলস।

ঐ শরীরে কয়েক মিনিট আগেই আমার পিচ্ছিল যাতায়াত ছিলো। গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ার পর আমি ফিরে আসি। ফিরে এসে আমি ড্রয়িং রুমে বসি। শর্টসটা কোমরে জড়াই, শরীরে উপরে এখনো কিছু নেই। ফ্রিজ থেকে চিল্ড বিয়ারের ক্যান বের করে গলায় ঢালি। সিগারেটের প্যাকেটে খুলি, রিমোট টিপে এই সেই চ্যানেল ঘুরাই।

মায়িশার আম্মা এখন কোনো কথা বলবেন না আর। উপুড় হয়ে পড়ে থাকবেন দীর্ঘক্ষণ। এ সময় কেবল তার নিঃশ্বাসের শব্দ। তৃপ্তির নিঃশ্বাস। কয়েক মিনিট পর নিঃশ্বাসের শব্দ বদলাবে। ফোঁপানো কান্নার আওয়াজ উঠবে। আরো পরে উঠে তিনি বাথরুমে যাবেন নিরাবরন অবস্থাতেই। কান্নার আওয়াজ বাড়বে, সেই সাথে ট্যাপকলের পানির শব্দ। বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে আসার পর বিছানায় ছড়িয়ে থাকা তাঁর গোলাপী রংয়ের ব্রা প্যান্টি কুড়িয়ে নেবেন, লেবু রংয়ের কামিজ সালোয়ার ওড়না গায়ে জড়াবেন, সবশেষে কালো স্কার্ফে ঢেকে নেবেন তাঁর দীর্ঘ চুল ও আমার দাঁতের দাগ বসানো রাজহংসীর মতো গলা। আমি হয়তো তখন বিয়ারের তৃতীয় ক্যান খুলছি। মায়িশার আম্মা বেরিয়ে যাবেন। যাবার সময় একবার শুধু পেছনে ফিরে বলবেন, 'তুমি এসবের কোনো দায়িত্ব নেবে না?'

হয়তো কাল কিংবা তার পরদিন আমি মায়িশা নামের ছোট্ট পুতুল পুতুল মেয়েটাকে আবার পড়াতে যাবো, যে মেয়ে শহরের সেরা ইংলিশ স্কুলে পড়ে। মায়িশার আব্বা আমাকে বুঝাবেন কেনো রাজনীতি ও ধর্ম আলাদা থাকা উচিত নয়, আমি পড়ানো শেষে বেরিয়ে আসার সময় আরেক বাচ্চা হুজুর গিয়ে ঢুকবে মায়িশাকে কোরানের তালিম দিতে। মায়িশার পর্দানশীন আম্মার সাথে আমার দেখা হবে না সেখানে।

তার পরের সপ্তাহে কোন একদিন যখন মায়িশার আব্বা রাজনীতি অথবা ধর্মপ্রচার অথবা ব্যবসার কাজে শহরের বাইরে, মায়িশার আম্মা তখন আমার বিছানায় উঠে আসবেন তাঁর কালো বোরকা, সবুজ সালোয়ার কামিজ, গোলাপী ব্রা প্যান্টি খুলে ফেলে। আমি তার সরু কোমরের নিচে জেগে উঠা মাংসল কলসে হাত বুলাবো, আমার কৈশোরের রাখালগঞ্জের সেই রাস্তায় ফিরে যাবো, যে রাস্তায় আমি প্রথম বাইসাইকেল চালানো শিখেছিলাম। বাইসাইকেল নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে চন্দ্রনাথ বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেনীর বালিকা মোচ্ছামাৎ নুরজাহান আক্তার সোমার প্রেমে পড়েছিলাম। আরো কয় বছর পর যখন আমি রাখালগঞ্জ ছেড়ে চলে আসি নগরে, তখন বাইসাইকেল ছেড়ে মোটর সাইকেল চালানো শিখে গেছি। 'তুমি কোন দায়িত্ব নেবে না?', প্রশ্ন রেখে মোচ্ছামাৎ নুরজাহান আক্তার চলে গেছে শ্বশুরবাড়ী তার আগের বছর।

বিয়ারের ক্যান আরো তাড়াতাড়ি খালি হতে থাকলে টিভির চ্যানেল ও দ্রুত বদলায় এসময়। প্যালেস্টাইনে মরেছে আরো কয়েক ডজন, দারফুরে শিশুর চেয়ে শকুনের পুষ্টি বেশি, বাংলাদেশে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর নিরন্নের মিছিল। কোন হারামজাদা যেনো উপদেশ দিলো ভাতের বদলে বিষ খেতে।

থকথকে মানুষের মুখ, গনগনে মানুষের মুখ, না খাওয়া মানুষের প্রশ্নবোধক মুখ। আমার হাত কাঁপে, পা কাঁপে, আমার ভেতর-বাহির কেঁপে উঠে। এতো এতো প্রশ্ন, এতো এতো অভিযোগ আমাকে ঘিরে ধরে। কেনো, কেবল আমাকেই কেনো?

আর কোন শালা কিসের দায়িত্ব নিলো কবে?

ব্লগনাম / হাসান মোরশেদ
এখন আছেন / স্কটল্যান্ড, যুক্তরাজ্য
যোগাযোগ / hasan_murshed@hotmail.com

ট্র্যাফিক সিগন্যালে একদিন

শাহরিয়ার মামুন

সকালে ঘুম থেকে উঠেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো শাফায়েতের। আজও অ্যালার্ম মিস করেছে। ড্রাইভারকে গাড়িটা বের করতে বলে দুটো পাউরুটি টোস্ট করে তাতে জেলি মাখিয়ে কোনোমতে মুখে গুঁজে খবরের কাগজ হাতে নিয়েই দৌড়। কফি খাওয়ার সময় আর পাওয়া গেল না।

বনানীতে এসে আজকেও গাড়ি থামল সিগন্যালে। এটা এখন রোজকার রুটিন হয়ে গেছে। কব্জি উল্টিয়ে হাতঘড়িতে সময় একবার দেখে নিয়ে আবার খবরের কাগজে মুখ ডুবালো শাফায়েত। মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটল গাড়ির জানালায় টোকার আওয়াজে। মুখ তুলে চোখের ফাঁকে একটা ভিক্ষুক দেখে দ্বিতীয়বার আর তাকালো না। আজকাল রাস্তাঘাটে ভিক্ষুকের সংখ্যা এত বেড়েছে যে ব্যাপারটা এখন মানবিকতার চেয়ে খানিকটা বিরক্তির উদ্রেক করে। তাছাড়াও গত সপ্তাহে একটা ম্যাগাজিনে ভিক্ষুকদের নানান কায়দা কৌশল করে লোকদের ঠকানোর কথা পড়ে ওদের অসহায়তার উপর বিশ্বাস আরো উঠে গেছে।

ওদিকে ভিক্ষুকটাও নাছোড়বান্দার মত সমানতালে জানালায় টোকা দিয়েই যাচ্ছে। খানিকটা বিরক্ত হলেও খবরের কাগজ থেকে আর মুখ তুলল না সে, এমনকি ড্রাইভারের বিরক্ত সুরে ধমক দেয়া শুনতে পেয়েও না। বেশ কিছুক্ষণ পর কিছুটা হয়তো হতাশ হয়েই হাল ছেড়ে দিল ভিক্ষুকটা, যেন বুঝতে পেরেছে তার ওই মৃদু টোকার আওয়াজ জানালার কাঁচ ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে পারলেও ভেতরে বসে থাকা মানুষটার কাছে পৌছুতে পারবে না। তখন কি মনে করে সাইড মিররে চোখ পড়তেই শাফায়েত দেখতে পেল আসলে এক বৃদ্ধা মহিলা এতক্ষণ জানালায় টোকা দিচ্ছিলো, বয়স সত্তরের উপর হবে, পরনে বেশ পুরনো ছেঁড়া শাড়ি। হাতে থালা নিয়ে পাশের গাড়ির দিকে এগুচ্ছে। হঠাৎ করেই কেন যেন একটু মায়া লাগতে লাগল। ক্লান্ত শরীর - চেহারায় এক রাশ হতাশামাখা কষ্ট স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছিল। শাফায়েত একবার ভাবলো - ডেকে কিছু সাহায্য করবে কিনা। কিন্তু আশ্চর্য হলেও কেন যেন আবার ডাকতে বেশ সংকোচ হচ্ছিল। আবার খবরের কাগজে মন দিলো।

একটু পরে বিকট এক আওয়াজ। বাইরে তাকাতেই আঁতকে উঠল শাফায়েত। পাশের লেনে উল্টো দিক থেকে ভুল রাস্তায় ছুটে আসা একটা গাড়ি গতি সামলাতে না পেরে ধাক্কা দিয়েছে ভিক্ষুককে, হাতের থালাটা ছিটকে পড়েছে খানিক দূরে। গাড়ির উইন্ডশিল্ডেও ফাটল ধরেছে কয়েক জায়গায়। গাড়ির ভেতর চার পাঁচজন উঠতি তরুণ-তরুণী। ওদেরই একজন গাড়ি ড্রাইভ করছিলো। বৃদ্ধা ভিক্ষুক কোনোমতে উঠে চারপাশে ছিটকে পড়া টাকাপয়সাগুলো অভিযোগহীনভাবে কুড়িয়ে নেয়া শুরু করল। দূরে ট্র্যাফিক পুলিশটা দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখছিল সব। ওদিকে গাড়ি থেকে দুতিনজন নেমে বেশ দুঃখ প্রকাশ করা শুরু করল, 'ওহ গড! এটা কি হল! ওহ মাই গড!'

হঠাৎ করেই শাফায়েতের মনে হলো, মানবিকতা পুরোপুরি শেষ হয়ে যায় নি। সিগন্যালটা ঠিক ওই মুহূর্তে ছাড়লো। পরের কথাটা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল সে, 'ওহ মাই গড! উইন্ডশিল্ডটা দেখেছিস! ড্যাডিকে এখন আমি কি বলবো?'

ব্লগনাম / অতন্দ্র প্রহরী
এখন আছেন / ঢাকা, বাংলাদেশ
যোগাযোগ / shahriar_410@hotmail.com

তর্কপ্রগতির জন্য প্রকল্পিত একটি অসমাপ্ত সেমিনারের প্রতিবেদন

মুজিব মেহদী

তর্কপ্রগতির হিতার্থে আমরা ‘ব্যাধি ও স্বাস্থ্য দাঁড়ানো পাশাপাশি’ নামে একটি আলোচনাপত্র সামনে আনলাম

একজন অংশগ্রহণকারী বললেন, স্বাস্থ্যকে যদি ব্যাধির আগে আগে হাঁটায় অভ্যস্ত করা যায়, তবে অনেকদূর যাওয়া সম্ভব

অন্যজন বললেন, ব্যাধি জন্মগতভাবেই দ্রুতগামী। স্বাস্থ্যকে দ্রুত হাঁটায় অভ্যস্ত করতে করতে ব্যাধি তাকে ছুঁয়ে দিতে পারে, এজন্য বেস্ট হচ্ছে আগেভাগেই ব্যাধিকে সমূলে বিনাশ করা

যে কোনো সংকট-উত্তরণে আগে নিজের খামতিটা খুঁজে দেখা দরকার, তৃতীয়জন বললেন

এসব দুর্বল মানুষের দর্শন, দ্বিতীয়জন জবাব দিলেন

জগৎটা কিন্তু মশাই দুবল মানুষের কাছেই নিরাপদ, বললেন প্রথমজন

সে বটে, কিন্তু দুর্বল মানুষ জগতের কাছে নিরাপদ নয়, বললেন চতুর্থজন

কিন্তু আপনি সবল হলেও দুর্বলের স্বাধীন চলকে তো রদ করতে পারেন না মশাই, এটা গণতন্ত্রসম্মত নয়, প্রথমজন টিপ্পনী কাটলেন

তাহলে আমার সবল হয়ে ফায়দা কী, গণতন্ত্রে তো আসলে বল খাটানোই চলে, শত্রুকে যদি একান্ত শত্রুই মনে করি, তাহলে তাকে নাশ করতে হবে আমার অস্তিত্বের স্বার্থেই, নইলে আমি টিকব না, দাপুটে জানান দিলেন দ্বিতীয়জন

আপনাকে খুব অধৈর্য মনে হচ্ছে, বললেন তৃতীয়জন

আপনারা ধৈর্য ধরে থাকুন, আমি ওসবে নেই, জানালেন দ্বিতীয়জন

বাদ দেন, আপনার সাথে বিতর্ক চলে না, প্রথমজন রণে ভঙ্গ দিলেন

আপনি জাহান্নামে যান, দাঁত কিটমিট করে তাকালেন দ্বিতীয়জন

রাগে কোনো প্রগতি নেই, নেই আক্রমণেও, আমাদের বুঝে দেখতে হবে পরস্পরকে, আমরা কেননা আছি পাশাপাশি সকলেই, সমাধান খুঁজে পেতে হবে দোহে আলাপে-লজিকে, আসুন আমরা আলাপের জন্য তৈরি হই, এই মানসিকতাটাই এখন আমাদের বেশি প্রয়োজন -- সভাপ্রধান সমাপ্ত করলে, আমরা ‘ব্যাধি ও স্বাস্থ্য দাঁড়ানো পাশাপাশি’ লেখা ব্যানারটা নামিয়ে আনলাম

ব্লগনাম / মুজিব মেহদী
এখন আছেন / ঢাকা, বাংলাদেশ
যোগাযোগ / m.mehdy@gmail.com

পুনশ্চঃ

নিঝুম

নাভিদ পার্কিং লট থেকে গাড়ী ঘোরাতেই মিসেস জুডি'র মুখোমুখি হলো। না দেখার ভান করবে কি করবে না ভাবার আগেই বুড়ি গাড়ী থামানোর জন্য হাত উঠালো। 'খাইছে রে' বলে দৌড় দেবার সুযোগ থাকলে নাভিদ কোনো কালেই তার এই ভাঙ্গাচোরা ভক্সহলের কথা মাথায়ও আনতো না, কিংবা সামনের বড় রাস্তায় হলে সুরুত করে স্টিভ এর বেগল শপে ঢুকে যেতো। যতোই অখাদ্য কিংবা কুখাদ্য স্টিভ বানাক না কেনো আর যতই তার বেগল 'পৃথিবীর এক মহান বস্তু' এই কথা প্রচার করুক না কেনো, মিসেস জুডির প্যানপ্যানের থেকে তা অতি উত্তম বলেই নাভিদের নিশ্চিত ধারনা। এইতো গত রাতে বুড়ি ঘরে এসে দুনিয়ার হাউকাউ শুরু করে দিলো। নাভিদ কেনো ঠিকমত খায় না, ঘরে আসে না, এত এলকোহল খেলে লিভার চলে যাবে, দুনিয়ার হাবিজাবি কথাবার্তা। ওখানে শেষ হলেও কথা ছিলো, এরপর আবার শুরু হলো ফিচফিচ কান্নাকাটি। নাভিদের বলতে ইচ্ছে করে, 'আরে বুড়ি, তোর ছিলা কুত্তারে নিয়ে তুই যে এত পিরিত করস, এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সে মুখে দুনিয়ার রঙ মাইখা ঘুরস, তোরে কিছু কইসি? শুধু তোর বাসায় থাকি বলে এত প্যাঁচাল। এই দেশে সারাদিন মানুষ এত কাজ করে, তোর কাজ নাই?' নাভিদের ঠিক বলা হয়ে উঠে না, বুড়ির জন্য মাঝে মাঝে খানিকটা খারাপই লাগে। ভাবতে ভাবতে আগের জায়গায় পার্ক করে নাভিদ। জুডি মনে হয় আজ ছাড়বে না। আজকে ক্রিসের পার্টি মিস। রেবেকার সাথে আজকে ডেটিং পাকাপোক্ত করা যেতো। এই মহিলার খপ্পরে আজকের রাতটাই মাটি।

'আমার বয়স তখন আটাশ। প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে গিয়েছি আমার হাজব্যান্ড আর একমাত্র ছেলে স্যামকে নিয়ে। স্যামের বাবার সাথে আমার পরিচয় ইউনিভার্সিটিতে। বাংলাদেশ নামের কোনো এক অজানা দেশের একটা ছেলে বছরের পর বছর সব রেকর্ড মার্ক পাচ্ছে এই ব্যাপারটা অন্তত আমি মেনে নিতে পারিনি। আমি নিজেও তখন কলেজ লেভেলে হার্ডফোর্ড থেকে হায়েস্ট মার্ক নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি। আমার ভেতরেও কেমন একটা ঈর্ষা কাজ করছিলো। প্রতিযোগিতা, মন কষাকষি, দেয়ানেয়ার এক পর্যায়ে আমরা বিয়ের সিদ্ধান্ত নিই। বাংলাদেশে হয়তো সে সময় যাওয়া হতো না। কিন্তু আমার শ্বশুরের ব্রেন স্ট্রোকের খবর পেয়ে আমরা আর দেরি করিনি। যতদূর মনে পড়ে উনিশশো একাত্তরের মার্চের তিন তারিখে আমরা ঢাকা পৌছাই। ঢাকা তখন উত্তাল আর মিছিলের শহর। সাত তারিখে শেখ মুজিবের ভাষণের পরই স্যামের বাবা বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িয়ে পড়ে। আমি তখন বাংলাদেশের এই পরিস্থিতি দেখে বারবার স্যামের বাবাকে ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে বলি। স্যামের বাবা কিছুতেই রাজী হয় না। বাবার কাছে আরো কয়েকটা দিন থাকার জন্য ওর ব্যাকুলতাও আমি টের পাই। তাই আমরা ঠিক করি আমি দশ তারিখ স্যামকে নিয়ে চলে যাবো আর স্যামের বাবা ছাব্বিশ তারিখ ফিরে আসবেন। পঁচিশ তারিখ রাতে আমার শ্বশুরবাড়ীতে আর্মি জিপ ঢোকে। এটুকু বলে একটু থামে জুডি, 'নাভিদ, তোমাকে শেষটা অন্য আরেক দিন বলি?' নাভিদ জুডির চোখের দিকে তাকায়। এর শুনতে ইচ্ছা হয় না, খানিকটা ঝুঁকে এসে মিসেস জুডি নাভিদকে প্রশ্ন করে, 'কি? আজ রাতের মাতলামোটা বন্ধ করে দিলাম? গার্লফ্রেন্ড হিসেবে আমিও কিন্তু কোন অংশে কম নই।' রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খিলখিল করে হেসে ওঠে মিসেস জুডি।

পুনশ্চঃ

মার্চের বরফ পড়া শুরু হয়েছে। এই সময়টায় এক সেকেন্ডের জন্যও বাইরে বেরুতে জঘন্য লাগে। পেছনের মাঠে বাচ্চারা স্নোহাউস বানাচ্ছে মহা উৎসাহে। ওদের চিৎকারে ডুভেটের নীচে থাকাও অসম্ভব। মিসেস জুডির মৃত্যুর পর নাভিদের অনেকবার ইচ্ছা হয়েছিলো এই বাসাটা ছেড়ে দেবার। স্যামকে বলেও ছিলো সে কথা। কি করে যেন আর ছাড়া হচ্ছে না। নাভিদ জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। সামনের গ্রেভইয়ার্ডটা সাদা বরফের চাদরে ঢেকে গেছে।

ওইখানে কোথাও হয়তো শুয়ে আছেন মিসেস জুডি।

ব্লগনাম / নিঝুম
এখন আছেন / লন্ডন, যুক্তরাজ্য
যোগাযোগ / blessfulhell@hotmail.com

অস্তিত্বের অন্ধকার

শোহেইল মতাহির চৌধুরী

জমাট অন্ধকারে গাছপালা, ঘাস, মানুষ সবকিছুর বিচিত্র সব রং শুষে তৈরি হয়েছে এক ছায়া-সমুদ্র। আলোর খবরদারি নাই বলে ভ্রম হয় সেখানে বস্তুরও অস্তিত্ব নাই। শব্দে-গন্ধে-নড়াচড়ায় তবু মন সায় দেয়, কিছু হয়তো আছে। অগ্নিকোণে ক্লিনিকের কলতলায় লম্বা বাঁশের আগায় ঝুলতে থাকা চল্লিশ ওয়াটের বাল্বটাই এই ছায়া-সমুদ্রে একমাত্র আলোর বিন্দু। কিন্তু দূর আকাশের তারার মত সেই বিজলির আলো এই জায়গা পর্যন্ত এসে পোঁছায় কিনা তা মালুম করা মুশকিল। কারণ সেই আলোয় কোনো মানুষ বা বস্তুর ছায়া তৈরি হয় না। তারপরও এই ভুষা কালির মত অন্ধকারেও অনুমান হয় দুইটা ছায়া-শরীর ছায়া-আমগাছের তলায় আজিব ভঙ্গিতে নড়াচড়া করছে। এতদূর থেকে তাদের কথাবার্তা শুনতে না পারারই কথা, তবে কথা তারা নিশ্চই বলছিল। সেগুলোকে সাজালে নিচের মত সংলাপই পাওয়া যায়:

'এতো ফ্যাশানের দরকার কি? কাপড়টা এখন অন্ততঃ উপরে তোল। আর পা ফাঁক কইরা দাঁড়া। অন্ধকারে কিছুই ঠিকঠাক দেখবার পারতাছি না।'

'দেইখো আমার গায়ে ফালাইও না। এই রাইতে গোসল করতে পারতাম না।'

'চুপ, আস্তে কথা ক। আওয়াজ পাইলেই আশপাশের মানুষ দল বাইন্ধা আইবো। তাড়াতাড়ি কর। নে হাত দিয়া ধর।'

'ইস, এই কাম করতে আমার আর ভালো লাগে না। মনে হয় পলাইয়া যাই।'

'পলাইয়া যাবি কই। আর কোনো কাম কইরা এত পয়সা কামাইতে পারবি? গফুর চৌকিদারের চিকিৎসার পয়সা দিবো কেডা?'

'পয়সাই সব? মনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য নাই।'

'যেই খানকির জন্ম হইছে পাড়ায় তার আবার সতীপনা।'

'তুমিও আমারে জন্মের খোঁটা দেও।'

'হৈছে। আর অভিমান করন লাগতো না। শেষ কর।'

তারপর আমরা কিছুক্ষণ আর কোনো কথা শুনতে পাই না। ব্যস্ততায় হোক, মান-অভিমানে হোক দীর্ঘ সময় তারা আর কোনো বাক্য বিনিময় করে না। যদিও কোনো বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেয়া মুশকিল তবু তাদের কথাবার্তা থামার পর মনে হয় অন্ধকারটা যেন আরো ঘন হয়ে আসে। আরোও বেশ কিছুক্ষণ পরে ছায়াশরীর দুটাকে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে কলতলার দিকে আসতে দেখা যায়। তাদের হাঁটার ছন্দ বড়ো আলু-থালু; সেটা সারাদিনের কাজের ক্লান্তিতে নাকি পাপ-বোধের গ্লানিতে তা অনুমান করা কঠিন।

'ভালো কইরা সাবান দিয়া ঘইষা ঘইষা ধো।'

'পাপ তো আর ধুইলে যাইব না।'

'যাগো পাপ তাগো পাপ। আমাগো পাপ অইবো কেন। এইটা আমাগো ডিউটি। ক্লিনিকে যারা আসে তারা পাপের সিলমোহর থাইকা বাচনের লাইগা আসে রে বুদ্ধু। তবে এইগুলার এখনও জান আসে নাই। রক্তের দলা।'

'রক্তের দলা, এই কথা তোমরা হগলে কও। কিন্তু আমি তো বাঁইচা আছি।'

'আরে গাধা, তোর তো স্বাভাবিক জন্ম অইছে। প্যাশেন্ট রিলিজ নিয়া চইলা যাওয়ার পর নার্স আইসা দেখে ঘরের কোণায় কাঁথামোড়া দিয়া তোরে রাইখা গেছে। তোরে পাইয়া গফুর চৌকিদারের বউ যে কি খুশি হইছিলো।'

ঘুরে ঘুরে এই ঘটনাই ঘটে প্রতিদিন আর দৈনিকই কম্পাউন্ডার চাচার কাছে নিজের জন্মবৃত্তান্ত আরেকবার শুনে নিয়ামত সারারাতের জন্য চুপ মেরে যায়। তারপর প্রতিদিনই ক্লিনিকের বাইরে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ায় নিয়ামত যেন কারো আসার অপেক্ষা করছে। ক্লিনিকের সাইনবোর্ডটা আলো দিয়ে অন্ধকার তাড়ায় ছবি আঁকা মায়ের কোলে শিশু। মমতায় মাখামাখি হয়ে আছে মা ও শিশুটি। সে ছবির দিকে তাকিয়েই নিয়ামত জোরে জোরে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়তে থাকে, 'মিছা ছবি, মিছা ছবি'। নিয়ামতের ইচ্ছা হয় চারপাশ থেকে অন্ধকার এনে সাইনবোর্ডটাতে লেপ্টে দিতে, কিন্তু অন্ধকারকে ধরার উপায়টা তার জানা নাই। আর একারণেই। শুধু গল্পের এই রাতে নয় প্রতি রাতে, নিয়ামত সাইনবোর্ডের আলোর নিচে দাঁড়িয়ে থাকে, একা একা।

ব্লগনাম / শোহেইল মোতাহির চৌধুরী
এখন আছেন / লন্ডন, যুক্তরাজ্য
যোগাযোগ / ShohailMC@gmail.com

পথে

মুজিব মেহদী

সৌরভটা এমন বেগে নাকে এসে হামলে পড়ল যে আবেশে মনের মধ্যে তুলতুলে একটা স্বপ্ন ওড়বার জন্যে পাখা ঝাপটাতে শুরু করে দিল, কিন্তু চতুষ্পার্শ্বের বাতাসের প্রতিটা কণা মোহনীয় লাগতে থাকায় কোনদিক ছেড়ে কোনদিকে যাবে এ ভাবনার কূল খুঁজে না-পেয়ে ঘুরানি দিতে দিতে সে দীর্ঘ একটা শ্বাস টেনে নিল এবং দমের শেষপ্রান্তে পৌঁছে অনিচ্ছায়ও সশব্দ একটা নিঃশ্বাস ফেলল

ওই আর্ত শব্দে ছুটন্ত বালিকাটি বাতাসে উড়তে থাকা ওড়নার ফাঁক দিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে একটিবারমাত্র তার দিকে তাকাল ও ‘পরোয়া করি না’ ঢঙে পুনরায় হণ্টনক্রিয়ায় মগ্ন হলো

সে দেখল, সব মনোযোগ কেড়ে নেয়া সৌরভকে অনুসরণ করছে একটামাত্র ক্ষুধার্ত রঙিন প্রজাপতি

ব্লগনাম / মুজিব মেহদী
এখন আছেন / ঢাকা, বাংলাদেশ
যোগাযোগ / m.mehdy@gmail.com

দিয়াশলাই

সচলায়তন অণুগল্প সংকলন

বৈশাখ ১৪১৫

প্রকাশায়তন, ঢাকা- ১২১৩

ISBN 984-300-002033-0